খাদ্য

মিনু মাসানি



টাটা সন্‌স্‌ লিমিটেডের পক্ষে
পদ্মা পাব্লিকেশনস্‌ লিঃ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত 'ইয়োর ফুড্‌' নামক
ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ

জুন—১৯৪৫
প্রথম সংস্করণ
মূল্য—৸৹ আনা

পূর্ব্বাশা লিঃ, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু কলিকাতা হইতে
সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল পুস্তকের ভূমিকা

ভারতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে টাটার কর্তৃপক্ষ যে গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন "খাদ্য" তাহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। যাহাতে উপরোক্ত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে চারিদিকে জ্ঞান ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহার সাহায্যে জনমত গড়িয়া উঠিয়া নীতি ও কার্যক্রম প্রভাবিত হয় তাহাও এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য।

মানুষের জীবনে যতগুলি সমস্যা আছে তাহার ভিতর সর্বাপেক্ষা বিশ্বজনীন ও দুর্নিবার সমস্যা হইল ক্ষুধা ও ক্ষুন্নিবৃত্তির সমস্যা। গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তকে সেইজন্য এই সমস্যার বিষয়েই আলোচনা করা হইয়াছে। খাদ্যের সমস্যা মর্মান্তিকভাবে সাম্প্রতিক অবস্থার সহিত জড়িত। "সমস্ত মানুষই খাদ্যের ভোক্তা। আর সেই খাদ্য উৎপাদন করে সমগ্র মানবসমাজের দুই তৃতীয়াংশ লোক।"

খাদ্যব্যাপারে অতিরিক্ত খুঁতখুঁতে লোককে একরকম কেহই পছন্দ করে না; ভরসা এই যে এদেশে সেই শ্রেণীর জীবের উদ্ভবের এখন পর্যন্ত কোন আশংকাজনক কারণ ঘটে নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত ঐশ্বর্যশালী দেশের পক্ষেই এইরূপ বিলাসিতা সম্ভব। *Wall Street Journal*-এর মতে এই ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্র নাকি অতিরিক্ত খাদ্যভার সমস্যার দ্বারা পীড়িত। আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোক কোনপ্রকারে কায়ক্লেশে টিকিয়া আছে, কি করিয়া অধিক খাদ্য ও উৎকৃষ্ট খাদ্য উৎপাদন করা যায় ইহাই হইল আমাদের সম্মুখে আসল সমস্যা। সমস্যাটি যে কিরূপ গুরুতর তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিলে এবং কি ভাবে তাহার সমাধান হইতে পারে সে সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা আগে হইতে না করিতে পারিলে সমস্যার সমাধান আমরা করিতে পারিব না। খাদ্যকে প্রকাশনার তালিকায় প্রথম স্থান দেওয়ার তাহাও একটি কারণ।

বইটি লিখিয়াছেন টাটার জনসংযোগবিভাগ (Public Relations Department)-এর শ্রীযুক্ত এম, আর, মাসানি। স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া বইটি যাহাতে ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহা লেখা হইয়াছে। কাজেই গ্রন্থকার কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করেন নাই,

জনগণের বোধগম্য ভাষায় সহজ সরল ভাবেই বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন। ইহা গুরুভার তথ্যসম্বলিত রচনা নহে, সুতরাং ইহাকে বরং বৈঠকী আলোচনা বলা ভালো। ছবিগুলি আঁকিয়াছেন শ্রীযুক্ত এ, আর, অ্যাক্‌ট্।

পুস্তকটির রচনা ব্যাপারে ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী স্যর ফিরোজ খারেগাট যে মূল্যবান সাহায্য দান করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। কুনুরের খাদ্যমূল্য অনুশীলন গবেষণাগার (Nutrition Research Laboratories)-এর ডিরেক্টার ডাঃ ডব্লু, আর, এক্রয়েড গ্রন্থকারকে স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে বিশেষজ্ঞোচিত সাহায্য করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, গবেষণাগারে লভ্য সমস্ত প্রকার সুবিধা ও তথ্য তিনি তাঁহাকে তাঁহার কাজে লাগাইবার সুযোগ দিয়াছেন এইজন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা বলা প্রয়োজন যে গ্রন্থকার পুস্তকে যেসব মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার একান্ত স্বকৃত, উভয়ের কেহই সেইজন্য দায়ী নহেন।

যদি দেখা যায় যে বইটি সর্বত্র সাড়া জাগাইয়াছে তাহা হইলে ভারতীয় কয়েকটি প্রধান প্রধান ভাষায় ইহার অনুবাদের ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা রহিল। যে সমস্ত পল্লী-সংগঠন কেন্দ্র কিম্বা শিক্ষা ও অন্যবিধ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পুস্তকটি সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না, বিনা মূল্যে বই চাহিয়া পাঠাইলে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে টাটা কর্তৃপক্ষ বর্তমান সঙ্কোচের দিনের পক্ষে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন।

১লা ডিসেম্বর
১৯৪৪

এইচ, পি, মোদী

অদ্ভুত হ'লেও সত্য

জীবজগতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে নিজের খাদ্য নিজে ফলায়। অন্যান্য প্রাণীরা হয় যখন-যেখানে খাদ্য পায় তখুনি তা খায়; নয়তো খাদ্য সংগ্রহ ক'রে তা জমিয়ে রাখে; আর তা না হ'লে অন্য পশু মেরে উদরপূরণ করে। ডরোথি ওয়েলেস্‌লির একটি মজার কবিতায় এই তফাৎটি বড়ো চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে :

ভাবনাহীন যে ভেড়ার পাল
এ কথাটা মিছা না—
খাচ্ছে যা তাই চলার পথ
খাচ্ছে যা তাই বিছানা!





মাছের দল যদি
ফিরিত নিরবধি
মোদের পায়েপায়ে অনুখণ,
ডিমের বিছানা আর
মেঝে হ'তো মোরব্বার
কী মজার হ'তো তবে
এজীবন!

মানুষই একমাত্র জীব যে মাটিতে বীজ বোনে ও ফসল ফল্‌বার আশায় অপেক্ষা করে। সব সময়ই যে এরকমটি ছিল তা নয়। সভ্যতার শৈশবে মানুষ নিজের খাদ্য নিজে জন্মাতো না। আদিম মানুষ ছিল নিছকই শিকারী ও খাদ্যসংগ্রাহক। তারপর এমন একটা সময় এলো যখন সে হঠাৎ আবিষ্কার করলো যে তার যা যা দরকার সে তা সত্যিই মাটি থেকে উৎপন্ন করতে পারে। অনেকের ধারণা, কোন আদিম জাতির মেয়েরা দৈবাৎ এই অদ্ভুত আবিষ্কারটি করেছিল। (নিচের ছবিটি দেখুন)।

তারা হয়ত বন্য শস্য ছড়িয়ে দিয়েছিল, কিম্বা তাদের এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো ঘরের পাশে থুতুর সঙ্গে বীজ ছিটিয়েছিল; তার পর তারা অবাক হ'য়ে দেখলে কিছু দিনের মধ্যে সেখানে নতুন শস্যের উদ্গম হয়েছে।



কৃষিবিদ্যা আবিষ্কারের ফল হ'লো এই যে জমি থেকে ক্রমেই অধিক-সংখ্যক মানুষের খাদ্যের সংস্থান হ'তে লাগ্‌লো। পৃথিবীর লোকসংখ্যা সেই কারণে ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে; তাও

ধীরে ধীরে নয়, বেশ দ্রুততালে। ভারতবর্ষ সেইসব দেশের অন্যতম যেখানে এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি খুবই স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিযুক্ত দেশগুলির মধ্যে একটি হ'ল আমাদের দেশ।

কিন্তু গোলমাল কোথাও একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। কারণ দেখা যায়, ভারতের মাটি আর তার অধিবাসীদের খাদ্যের জোগান দিতে পারছে না। ব্যাপারটি অদ্ভুত হ'লেও সত্য: একদিকে, ভারতবর্ষে আবাদী জমির পরিমাণ বিস্তর—ছত্রিশ কোটি একর পরিমাণ জমিতে এখানে চাষ হয়, তার ভেতর আবার শতকরা আশিভাগ জমিতে হয় খাদ্যশস্য ও পশুর আহার্য। আমাদের জমিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বভাবত খুব উর্বর। তা ছাড়া এদেশের জলবায়ু বিচিত্র, চাষ-আবাদের অনুকূল; মৌসুমী-বায়ু আমাদের প্রচুর পরিমাণে জল দেয় আর ঘন বন সকল আমাদের জমিরক্ষার কাজ করে। এদিকে আমাদের জনবলও রয়েছে অপরিসীম—চল্লিশ কোটি লোকের ভেতর এক গ্রামেই থাকে পঁয়ত্রিশ কোটি লোক, তার মধ্যে আবার শতকরা আশিভাগ লোক করে ক্ষেতের কাজ। চাষের সহায়ক গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও আমাদের প্রচুর। পৃথিবীর সমগ্র গৃহপালিত পশুর সংখ্যা হ'লো সত্তর কোটি, তার মধ্যে বিশ কোটি



অর্থাৎ মোটসংখ্যার শতকরা সাড়ে আটাশ ভাগ পশুর মালিকই হ'লাম আমরা।

এতো কিছু থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের আহারের সংস্থান করতে পারি না। এই অবস্থা এমনই আমাদের চোখ-সওয়া হয়ে গেছে যে কেউ যদি বলে যে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক সুসময়েও দিনে একবেলা পেট পূরে খেতে পায় না তা হ'লেও আমরা আঁৎকে উঠি না। ১৯৪৩ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের Hot Springs নামক জায়গায় যে খাদ্যসম্মেলন হয় তাতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিগণ এই অবস্থার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন, দেশের অবস্থা যখন স্বাভাবিক সেই সময়েও ভারতের একতৃতীয়াংশ লোক পেট ভ'রে খেতে পায় না। ১৯৩৩ সালে বাংলার জনস্বাস্থ্যের ডিরেক্টর বাহাদুর যে কথা বলেছিলেন তা এর চাইতেও মর্মান্তিক। তাঁর কথায় জানা যায় বাংলার কৃষককুল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যে খাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করে তাতে ইঁদুররাও কয়েক সপ্তাহের বেশি বাঁচতে পারে না! এটা হ'লো দশবারো বৎসর আগেকার অবস্থা। এদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগের গেলো বৎসরের হিসাবে দেখা যায় বাংলাদেশের ন্যূনাধিক পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে না খেতে পেয়ে ও খাদ্যাভাবজনিত অসুখে ভুগে মারা গেছে।

কী ক'রে এটা ঘটলো? কী হ'লে এই অদ্ভুত ঘটনা বোঝানো যায়? এই শোচনীয় অবস্থার নিরসনই বা করা যায় কী ভাবে? বর্তমান বইতে সে সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে।

২

আমরা কেন খাই ?

আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিতান্তই অভ্যাসবশত এমন কতকগুলি কাজ করি যাদের নিয়ে সামান্যমাত্র চিন্তাও আমাদের মনে জাগে না। আমরা সকালে ঘুম থেকে জাগি, চলাফেরা করি, লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি ও কথাবার্তা কই, আর রাত্রি হ'লে ঘুমুতে যাই। আরেকটি কাজও ঠিক এম্‌নি মসৃণ ভাবেই আমরা করি—তা হচ্ছে খাওয়া ও পান করা। যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞেস করে : 'তোমরা খাও কেন ?' তা হ'লে হঠাৎ আমরা চম্‌কে উঠ্‌বো, রাগত-ভাবেই হয়ত জবাব দেব, 'তার মানে ? এ প্রশ্ন করা কেন ? তুমি কি খাও না ?' অথচ, এটা খুবই সঙ্গত প্রশ্ন এবং আমাদের প্রত্যেকেরই এর উত্তর জানা উচিত।

আরও চেপে ধরলে, আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত বল্‌বেন, খেতে ভালো লাগে তাই খাই। জীবনে যা কিছু লোভনীয় বস্তু আছে তার মধ্যে খাদ্য একটি। জ্ঞানী ব্যক্তিরা দীর্ঘজীবন যাপনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, খাদ্য সুখভোগের নির্ভরযোগ্য ও স্থায়ী উপায়গুলির অন্যতম। আবার আমাদের মধ্যে এমন একদল আছেন যাঁদের আহারে রুচি নেই, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটাকে যাঁরা একটা হ্যাঙ্গামা ব'লে মনে করেন—তাঁরা বল্‌বেন, না খেলে চলে না তাই খাই, বাঁচবার জন্যেই খাওয়া, খাওয়ার জন্যে বাঁচা নয়। কথাটা অবশ্য সত্য। খুব বেশি দিনের কথা নয়, মহাত্মা গান্ধী একুশদিন অনশন ক'রে ছিলেন, কিন্তু সেই ধাক্কা তিনি সাম্‌লিয়ে ওঠেন। দুদিন নয় দশদিন নয় সবশুদ্ধ সাতাত্তর দিন না খেয়ে

বেঁচে থাকার দৃষ্টান্তও রয়েছে। কিন্তু এগুলি ব্যতিক্রম মাত্র ; তাতে নিয়মটাই প্রমাণিত হয়। সহিষ্ণুতার এই দৃষ্টান্তগুলিকে লোকে যেরূপ বিস্ময়ের সহিত গ্রহণ করে তাতেই বোঝা যায় খাদ্যের উপর আমরা কতটা নির্ভরশীল—খাদ্য ব্যতীত সমগ্র মানবজাতি যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতো তাও এতে প্রমাণ হয়।

খাদ্য জিনিষটা বস্তুত কী, আর তা কী ভাবে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে ? কোন্ কোন্ উপায়েই বা তা আমাদের ভেতর প্রাণশক্তি সঞ্চার করে ? খাদ্যের প্রধান কাজ হ'লো তিনটি : (১) বল দান ; (২) দেহের গঠন ও পুনর্গঠন ; এবং (৩) জীবনধারণোদ্দেশ্যে দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও প্রক্রিয়াগুলির নিয়ন্ত্রণ।

খাদ্যের প্রাথমিক প্রধান কাজ হ'লো মানুষের দেহে শক্তিসঞ্চারের জন্যে ইন্ধন জোগানো। এই দিক থেকে শরীরকে একটি বাষ্পীয় যন্ত্র কিম্বা গতিবান মোটরগাড়ীর সঙ্গে যুক্তিযুক্তভাবে তুলনা করা যেতে পারে। ইঞ্জিন অথবা গাড়ী, যতোই বিশুদ্ধভাবে তৈরী হোক্ না কেন, তেল-জল-কয়লা ছাড়া যেমন চল্‌তে পারে না মানুষের শরীরও তেম্‌নি ইন্ধন ছাড়া নিজের কাজ করতে পারে না। আমাদের ইন্ধন কিছু আর সত্যি সত্যি কয়লা-পেট্রল নয় ; তা খাদ্যের এমন কতকগুলি উপাদান দিয়ে তৈরী যাদের বলা হয় স্নেহ ও কার্বোহাইড্রেট। প্রোটিনও মাঝে মাঝে ইন্ধনের কাজ করতে পারে। অম্লজান ও জলের সহযোগে এইসব ইন্ধন শরীর ও মনের চলাচল ও শ্রমের উপযোগী উত্তাপ ও বল সৃষ্টি করে। জান্তব ও শাকসব্জী—এই উভয়বিধ খাদ্যেই স্নেহপদার্থ বা চর্বি রয়েছে। ভেড়ার মাংসের চর্বি, মাখন, ঘি, মাছের তেল এইগুলি হ'ল জান্তব চর্বি। আর শাকসব্জীজাত চর্বি বল্‌তে বোঝায় জলপাইয়ের তেল, বাদাম তেল, নারকেল তেল, তিল তেল ও শর্ষের তেল। কার্বোহাইড্রেট

জাতীয় খাদ্য হ'ল দুইপ্রকার—এক, শ্বেতসার (starch), দুই, শর্করা। চাউল ও অন্যান্য শস্য, সাগু, বার্লি, আলু ও অপরাপর বহুবিধ খাদ্যের মধ্যে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থটির সন্ধান পাওয়া যায় আর শর্করা পাওয়া যায় আখ, মধু ও ফলাদি থেকে।

খাদ্যের দ্বিতীয় কাজ হ'ল দেহের গঠন ও বৃদ্ধির উপযোগী মালমসলা সরবরাহ করা। শরীর মেরামতের ভারটিও তার উপর। মানুষের শরীরের বৃদ্ধিকে এই দিক থেকে ইঞ্জিন কিম্বা মোটরগাড়ীর সঙ্গে তুলনা না ক'রে গৃহনির্মাণের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। একটি বাড়ী তৈরী করতে কতো হাজারো জিনিষেরই না দরকার হয়—পাথর, ইঁট, সিমেণ্ট, কাঠ, কাঁচ, টালি এসব আরো কতো কী। ঠিক তেমনি মানুষের শরীর তৈরী করবার কাজে বিচিত্র মালমসলা দরকার। বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক প্রভৃতি জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন যে এইসব মালমসলার মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হ'ল প্রোটিন নামীয় পদার্থগুলি। এই প্রোটিনের সাহায্যেই মাংস ও মাংসপেশীসকল এবং মস্তিষ্ক, যকৃৎ, মূত্রগ্রন্থি, হৃদয় প্রভৃতি দেহের বিচিত্র অংশগুলি তৈরী হ'য়ে থাকে। মায়ের জঠরাভ্যন্তরে শিশুভ্রূণ যে বেড়ে ওঠে তা'ও এই প্রোটিনেরই কল্যাণে। যতোদিন না শিশু একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ অথবা নারীতে পরিণত হয় ততোদিন পর্যন্ত প্রোটিন নানান স্তরের মধ্যে দিয়ে শিশুর বিকাশের সহায়তা করতে থাকে। ক্রমাগত পরিশ্রম ও চলাচলের ফলে দেহের যে ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় তা পূরণ করতেও প্রোটিনের দরকার। এই প্রোটিনজাতীয় পদার্থগুলি দুধ, মাংস, ডিম, মাছ প্রভৃতি জান্তব খাদ্যের মধ্যে যেমন দেখতে পাওয়া যায় তেমনি ডাল, বাদাম, প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ খাদ্য এবং কিছুপরিমাণে শস্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। খাদ্যের আরও দুইটি উপকরণ আছে, শরীরের গঠনে তাদের প্রয়োজন এতোটা জরুরী না

হ'লেও কিয়ৎপরিমাণে অন্তত তারা এবিষয়ে সহায়তা করে। এদের একটিকে বলা হয় স্নেহ বা চর্বি, যা আমাদের সবার মধ্যেই অল্প-বিস্তর আছে। এই স্নেহপদার্থই আমাদের দেহকে মসৃণ, সুচিক্কণ ও গোলালো ক'রে তোলে, এর খুব কমবেশি হ'লে অবশ্য এই অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে। অন্যটি হ'লো ধাতব লবণ (mineral salts) যা আমাদের অস্থি ও স্নায়ুসকল গ'ড়ে তোলার কাজে সাহায্য করে। একটু পরেই আমরা এই দুটি পদার্থ সম্বন্ধে সবিশেষ বল্‌ছি।

খাদ্যের তৃতীয় প্রধান কাজ হ'লো সেইসব ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা, যা "দেহের বিভিন্ন অংশকে তাদের যথাযথ কাজে চালু রাখে ও তাদের এমন এক সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যের আওতায় আনে যা জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক।" কথাটা শুন্‌তে একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে, নয় কি? কিন্তু খাদ্যের যে সমস্ত উপাদান দ্বারা এই জটিল প্রক্রিয়া সাধিত হয় তারা নিজেরাই যে একটু অদ্ভুত ধরণের। তাদের বলা হয় 'ভিটামিন' বা খাদ্যপ্রাণ। ১৯১২ সালে এই নামটি প্রথম দেওয়া হয়। 'ভিটা' অর্থ হ'লো জীবন আর সত্যিই জীবনের পক্ষে এই পদার্থগুলি অত্যাবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যপ্রাণের ভিন্ন ভিন্ন কাজ। কখনও তারা মানুষের শরীর তৈরীর কাজে যে সব মালমসলা (প্রোটিন) দরকার হয় তাদের নিয়ন্ত্রণ করে; কখনও বা তারা মোটরগাড়ীর পক্ষে অত্যাবশ্যক তেলের সঙ্গে তুলনীয়। এই তেল যদি না থাকে একা পেট্রলের (স্নেহ ও শ্বেতসার) সাহায্যে মোটরগাড়ী কখনও চল্‌তে পারে না। এক হিসেবে এদের খাদ্যের প্রধান উপকরণগুলির অনুচর বলা যেতে পারে। মানুষের দেহ নিজের প্রয়োজনে এগুলিকে সৃষ্টি করতে পারে না অথচ শুধু সাধারণ ভালোর জন্যেই নয় নিছক বেঁচে থাকার জন্যেই এগুলির দরকার। খাদ্যের ভেতর খাদ্যপ্রাণ এতো সূক্ষ্ম ও স্বল্পপরিমাণে

লুকিয়ে আছে যে এই শতাব্দীর সূচনা হওয়ার আগে পর্যন্ত এদের অস্তিত্বের কথা কেউ জানতোই না। এখন কিন্তু শুধু যে তাদের মৌলিক পদার্থ থেকে নিষ্কাসিত ও বিশ্লিষ্ট ক'রে নেওয়া যায় তাই নয়, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাদের বাস্তবিকই তৈরী করা চলে। তখন এদের বলা হয় যৌগিক খাদ্যপ্রাণ।

ইংরেজ কৌতুকরসিক এ, পি, হার্বার্ট তাঁর একটি মজার কবিতার মধ্যে দিয়ে এ বিষয়ে আমাদের বড়ো চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন। সোজা গদ্যে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, 'খাদ্যপ্রাণ ক' রিকেট হ'তে দেয় না, দুর্বল ও স্নায়ুপীড়িত লোকের পক্ষে তা উপকারক; উদরে গোলযোগ হলে বুঝতে হবে 'খাদ্যপ্রাণ খ'-এর অভাব ঘটেছে; 'খাদ্য-প্রাণ গ' হলো 'স্কার্ভি' (কাউর) রোগের শত্রু; কাজেই, যখনই কেউ খেতে প্রবৃত্ত হবে তার এই লাইনগুলি আওড়ানো দরকার—তা না হলে তাকে এইজন্যে পরে পস্তাতে হবে। যার যার নিজেকে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া উচিত কী তার অসুখ এবং তার প্রতিষেধক খাদ্যপ্রাণই বা কোনটি।

খাদ্যপ্রাণ ক চোখ, ত্বক, এবং ফুসফুস ও পাকাশয় প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের প্রান্তস্থিত ঝিল্লীগুলির (membranes) উপর প্রধানত ক্রিয়া করে। যথেষ্ট পরিমাণে একে গ্রহণ না করলে গোলযোগ দেখা দেয়। যেমন Keratomalacia নামে চক্ষুরোগ—ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে এরই জন্যে সাধারণত অন্ধত্ব ঘটে থাকে—খাদ্যপ্রাণ ক-এর সুস্পষ্ট স্বল্পতাই এর কারণ। বড়োই শোচনীয় যে প্রত্যেক বৎসরই এই রোগের ফলে বহু শিশু অকারণ অন্ধত্ব বরণ করে। আরেকটি চক্ষুরোগ—অবশ্য তেমন মারাত্মক নয়—ঠিক এইভাবেই ঘটে থাকে—সেটি হচ্ছে নৈশ-অন্ধতা (Night blindness)। এর

খাদ্যপ্রাণের আধার

ক


দুধ


মাখন


মাছের যকৃতের তেল


পশুর যকৃৎ




শাকসব্জী

খ১


খাদ্যশস্য


বাদাম

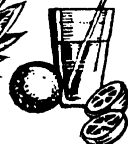

ডাল

খ২


দুধ


গাঁজলা

গ


নেবুর রস


টাটকা ফল


আমলকী

ঘ


ডিম


মাছের যকৃতের তেল


মাখন



ফলে সাধারণ সুস্থ লোক, যে দিনের বেলায় স্পষ্ট সবকিছু দেখতে পায়, রাত্রি হলেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। খাদ্যপ্রাণ ক পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে অবশ্য নৈশ-অন্ধত্ব অচিরেই দূর হয়ে যায়। খাদ্যপ্রাণ ক-এর স্বল্পতা হেতু আরেকটি রোগ হতে দেখা যায়, তাতে চামড়া শুক্‌নো বা খস্‌খসে হয়ে উঠে, দেখতে ঠিক ব্যাঙের চাম্‌ড়ার মতো দেখায়—এই জন্যে প্রায়ই একে "toad skin" নামে অভিহিত করা হয়।

জান্তব ও উদ্ভিজ্জ খাদ্যের কোন কোনটিতে খাদ্যপ্রাণ ক রয়েছে এরপর একথা জানতে চাওয়া স্বাভাবিক। উদ্ভিজ্জ খাদ্যের বেলায় একে বলা হয় ক্যারোটিন (carotene) বা সম-খাদ্যপ্রাণ ক (pro-vitamin A), স্থল ও জলের সমস্ত উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যেই একে প্রধানত খুঁজে পাওয়া যায়। স্থলজ ও সামুদ্রিক উভয় প্রকার উদ্ভিদের মধ্যেই ক্যারোটিন আছে। স্থলজাত উদ্ভিজ্জ, বিশেষ করে গাজর কিম্বা পত্রযুক্ত আনাজ প্রভৃতি ভক্ষণ অথবা যে সব পশু নিজেরা সবুজ মাঠে চড়ে বেড়িয়েছে তাদের দুধ পান বা যকৃৎ আহার করে আমরা খাদ্যপ্রাণ ক পেতে পারি। সামুদ্রিক গাছগাছড়া থেকে অবশ্য খাদ্যপ্রাণ ঠিক এভাবে পাওয়া যায় না, তাকে পেতে হয় কতকটা পরোক্ষভাবে। ছোট্ট শামুক বা ঝিনুক প্রথমত সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জ-গুলিকে খায়, তারপর ছোট



ছোট মাছ আবার এদের খেয়ে ফেলে, তারপর তারা নিজেরাই গিয়ে পড়ে আবার কড্‌ বা হাঙর প্রভৃতি বড়ো মাছের খপ্পরে। এবং যখন

আমরা এই বড়ো মাছগুলিকে খাই--আরও ভালো হয় যদি বলি কড বা হাঙরের যকৃতের তেল পান করি—তখন খাদ্যপ্রাণ ক প্রকৃতপক্ষে আমাদের উদরস্থ হয়। এতে সেই ছড়াটির কথাই মনে করিয়ে দেয়ঃ

বড়ো মাছির পৃষ্ঠদেশে
ছোটো মাছি বেড়ায় হেসে,
ছোটো মাছির পিঠ
কাম্‌ড়ে বেড়ায় আরও ছোটো কীট :
এম্‌নি ধারা আরও ছোটোর ছোটো
গোনাগুন্‌তি নেই যে তারা কতো ॥

খাদ্যপ্রাণ খ মাত্র একটি, গোড়ায় এই ছিল সবাকার ধারণা, কিন্তু বর্তমানে প্রমাণ হয়েছে খ খাদ্যপ্রাণেরও নানা রকমারি আছে, তাদের একটি শ্রেণীকে বলা হয় খ১ শ্রেণী, অপর শ্রেণীটির নাম খ২ শ্রেণী। খ১ খুবই দরকারী খাদ্যপ্রাণ। সেটা কেমন একবার দেখা যাক। যে বস্তুটি আমাদের শরীরে কার্বোহাইড্রেট-এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে সেটি হচ্ছে এই খ১ খাদ্যপ্রাণ। শরীরে এর অনুপস্থিতি ঘটলে বেরিবেরি নামক রোগ দেখা দেয়, বেরিবেরিতে পা দুর্বল ও নড়বড়ে হয়ে পড়ে এবং হৃৎপিণ্ড সমস্ত শরীরে রক্তসঞ্চালনের কাজে বাধা পায়। আমাদের দেশের অন্ধ্রের কোন কোন অঞ্চল, চীন, জাভা ও পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে বেরিবেরি প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। এখন দেখতে হবে কেন এটা হয় আর কোন কোন খাদ্যেই বা খাদ্যপ্রাণ খ১ পাওয়া যায়।

অন্যান্য অনেক জিনিষের মধ্যে গোটা শস্যদানা, দাল, বাদাম ও ময়দার তালের ভেতরই খাদ্যপ্রাণ খ১ সমধিক পাওয়া যায়। বেরিবেরি হয় তখুনি যখন আমরা মিলে ছাঁটা চাউল অথবা আটা খাই, কারণ যে তুষ ও বীজ খাদ্যপ্রাণ খ১-এর আধার, ছাঁটাই ও পালিশের ফলে

চাউল বা আটায় তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; কাজেই রোগ সহজেই দেহকে আক্রমণ করতে পারে। এটা বিশেষ করে অসিদ্ধ বা আতপ চাউলের বেলায় ঘটে। ছাঁটাইএর আগে চাউল যদি সিদ্ধ কিম্বা অর্ধসিদ্ধ না করা হয় তা হলেই এরকম হয়। অন্ধ্র-দেশের কোনও এক অঞ্চলের অধিবাসীদের এরকম 'অসিদ্ধ' চাউল খাওয়া অভ্যাস, তাই তাদের এই ভয়ঙ্কর অসুখ খুব বেশি হতে দেখা যায়।

খাদ্যপ্রাণ খ২ তিনটি প্রধান উপকরণ দিয়ে তৈরী, ব'লে মনে করা হয়। এদের একটি চোখ, জিহ্বা এবং অন্ত্রকে সুস্থ অবস্থায় রাখতে সহায়তা করে। যে সব জিনিষ থেকে খ২ খাদ্যপ্রাণ তার শক্তি আহরণ করে তারা হলো আভাঙা শস্যকণা, দাল, দুধ, যকৃৎ ও গাঁজলা।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য জিনিষ হলো খাদ্যপ্রাণ গ যা দেহে রক্তকণিকা সঞ্চারের পক্ষে মূল্যবান এবং ত্বকের পক্ষে হিতকারক। এই খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটলে 'স্কার্ভি' নামক রোগ হয়, যার ফলে দাঁত ও মাড়ি ফুলে উঠে, গাঁটে গাঁটে বেদনা হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুলে উঠে। এ ছাড়া সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষেও খাদ্যপ্রাণ গ আবশ্যক।

টাটকা ফল, শাকসব্জী ও অঙ্কুরিত দালের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ গ পাওয়া যায়। বিশেষ করে আমলকী হলো এর একটি প্রধান আধার। কমলা নেবুর মধ্যেও এই খাদ্যপ্রাণ রয়েছে, তবে একটি আমলকীতে যতোটা আছে তা দুটো লেবুর খাদ্যপ্রাণের সমান। যদিও খাদ্যপ্রাণ এই শতকেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে তা হলেও সুদূর খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পৃথিবীর সবসেরা জ্ঞানীদের অন্যতম

সম্রাট অশোক আমলকী যে খাদ্যপ্রাণ গ-এর আধার তা বোধ হয় অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি একবার লঙ্কার রাজাকে এক ঝুড়ি আমলকী ফল মূল্যবান উপঢৌকনস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন।

তাহলে আর বাকী রইলো খাদ্যপ্রাণ ঘ—যা দাঁত ও হাড়ের পক্ষে উপকারী। শরীরে খাদ্যপ্রাণ ঘ-এর অভাব ঘটলে একরকমের অসুখ হয় শিশুদের বেলায় যাকে বলা হয় রিকেট আর পূর্ণবয়স্কদের বিশেষ করে মেয়েদের হলে যাকে বলা হয় osteomalacia অর্থাৎ হাড়ের একপ্রকার বেতো ভাব। এই সব অসুখে হাড় নরম ও বক্র হয়ে রোগী খোঁড়া হয়ে পড়ে। মেয়েদের osteomalacia হয় বিশেষ করে তাদের গর্ভাবস্থায়। কারণ সে সময়ে মায়ের অস্থি থেকে খাদ্যপ্রাণ ঘ ও অস্থিগঠনের সহায়ক বস্তুসকল শুষে নিয়ে ভাবী শিশুর হাড় তৈরী হতে থাকে। যদি সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেবার ব্যবস্থা না করা হয় তা হলে মায়ের হাড়সকল এমনই বক্র ও বিকৃত হয়ে পড়ে যে সে খোঁড়া হয়ে যায়। এতে বস্তিদেশের সঙ্কোচন ঘটে, ফলে এমনও হয় যে আর তার পক্ষে সন্তানের জন্ম দেওয়া সম্ভব হয় না। বিশুদ্ধ দুগ্ধ, মাখন ও ঘি প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্য, ডিম ও কোন কোন মাছে খাদ্যপ্রাণ ঘ দেখতে পাওয়া যায়। মাছের যকৃতের তেলেও তা প্রচুর মেলে। সেইজন্যেই কড্ বা হাঙরমাছের যকৃতের তেল অথবা খাঁটি খাদ্যপ্রাণ ঘ গ্রহণ করলে রিকেট ও osteomalacia সেরে উঠতে দেখা যায়। খাদ্যপ্রাণ ঘ লাভ করবার আরেকটি উপায় আছে, সেটি সূর্যালোক। আমাদের ত্বকের উপর সূর্যালোকের ক্রিয়া থেকে এই খাদ্যপ্রাণ উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে সূর্যালোক খুব তীব্র বলে সে সব দেশের লোকেদের রিকেট প্রভৃতি অসুখ

বড়ো একটা হয় না, অথচ উত্তর ভারতের লোকদের, বিশেষত অন্তঃপুরের গুহায় আবদ্ধ মেয়েদের মধ্যে তার ছড়াছড়ি।

আরও কতকগুলি খাদ্যপ্রাণ আছে। তবে সেসব খুব উল্লেখযোগ্য নয় বলে তাদের আলোচনা আর করবো না।

আরেকটি খাদ্যবস্তু আছে, তার নাম ধাতব লবণ। এর কাজও অনেকটা খাদ্যপ্রাণের মতো। ধাতব লবণ প্রায় ত্রিশ রকমের—এদের কোন কোনটি হ'ল এসিড জাতীয়, অন্যগুলি ক্ষারদ্রব্য (alkalis)। পুষ্টির দিক থেকে এদের মধ্যে অধিক উল্লেখযোগ্য হ'লো ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস (গন্ধক), আইরন (লৌহ) ও আইওডাইন। এই ধাতব পদার্থগুলি কতকটা প্রোটিনের মতো দেহগঠনের, বিশেষত দাঁত ও হাড় তৈরীর কাজে সাহায্য করে, কতকটা খাদ্যপ্রাণের মতো দেহকে নিয়ন্ত্রিত করে।

দু'একটি ধাতব লবণের দিকে এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক্। ক্যালসিয়াম হ'লো এদের মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য—হৃৎস্পন্দনের ক্রিয়া অব্যাহত রাখতে, রক্ত ঘনীভূত করতে এবং হাড় ও দাঁত তৈরী করতে এর প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যহ কিছু পরিমাণে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করছি ও কিছু পরিমাণ শরীর থেকে নিষ্কাসিত করে দিচ্ছি। এর ক্ষতিপূরণ দরকার। প্রাপ্তবয়স্কদের চাইতে শিশুদেরই তা অধিক প্রয়োজন। গর্ভবতী স্ত্রীদের এর চাইতেও বেশি দরকার, কেন না, প্রয়োজনটা শুধু তাদের নিজেদেরই নয়, গর্ভস্থ ভ্রূণেরও বটে। যে সব জিনিষে ক্যালসিয়াম খুব বেশি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে দুধ একটি। ছোট ছোট বাছুর, মোষ ও পাঁঠার শরীরে এই অতি প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থটি প্রকৃতিদেবী এভাবেই যোগান দিয়ে থাকেন। ছেলেপিলেদের এ জিনিষটি যেমন দরকার পশুবৎসদেরও তা তেম্‌নি

চাই। সবুজপত্রযুক্ত সব্জী হ'ল ক্যালসিয়ামের আরেকটি প্রধান উৎস।

আমাদের শরীরের পক্ষে লৌহ আরেকটি অপরিহার্য ধাতব দ্রব্য। এর কাজ রক্তকে লাল ক'রে তোলা ও পেশীসমূহে অম্লজান বাষ্প সঞ্চার করা। দেহে লৌহের অভাব হ'লে রক্তাল্পতা ঘটে। সবুজ তরীতরকারী



বিশেষত, পালং শাক ও বাঁধা-কপির মধ্যে লৌহ খুব পাওয়া যায়। নাবিক পপেই কী ভাবে কোন কিছু করার আগে টিনকে টিন পালংশাক সেদ্ধ গলাধঃকরণ করছে নিশ্চয়ই সেটা পর্দার গায়ে অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বেন। এ থেকে সে যে শুধু লোহাই পাচ্ছে তা নয়, খাদ্যপ্রাণ ক আর ক্যালসিয়ামও সংগ্রহ করে নিচ্ছে। দুধ আর সবদিক থেকে একটা আদর্শ খাদ্য হলেও লৌহের দিক থেকে দরিদ্র। প্রকৃতিদেবী অবশ্য এই দিক থেকে নবজাত শিশুদের তরফে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেন। সাতমাসের উপযোগী লৌহ তিনি জন্মের সময়ই তাদের দিয়ে দেন।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান প্রায় প্রত্যেকটির সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। তা থেকে দেখা যায়, যে সব বিচিত্র খাদ্যদ্রব্য আমরা খাই নিম্নলিখিত পাঁচটি উপাদানের একটি না একটিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়ঃ (১) স্নেহ বা চর্বি, (২) কার্বোহাইড্রেট—শ্বেতসার ও শর্করা—, (৩) প্রোটিন, (৪) খাদ্যপ্রাণ, এবং (৫) ধাতব লবণ।

৩

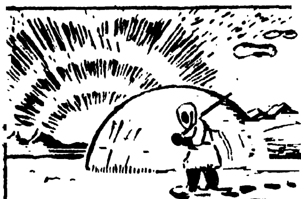
কতটুকু খাওয়া উচিত

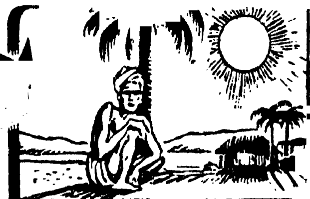
কতটুকু খাওয়া উচিত এ নিয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। এ সম্বন্ধে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণার উপর আস্থাশীল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তরুণদের বিশ্বাস তারা তাদের পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চাইতে অধিক খেতে পারে।

তা ছাড়া, কোন একটা বিশেষ খাদ্য কতটা পরিমাণ খাওয়া উচিত তা প্রায়ই তার স্বাদগন্ধের উপর নির্ভর করে। আমরা যদিও এ ব্যাপারে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণার দ্বারা চালিত হচ্ছি, বিজ্ঞান কিন্তু এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট হিসেব ক'রে দেখিয়েছে বেঁচে থাক্‌তে, শরীর সুস্থ রাখতে ও দেহকে কর্মক্ষম রাখ্‌তে হলে আমাদের বাস্তবিকই কতটা খাদ্যগ্রহণ করা উচিত।

এ বিষয়ে প্রথম পরীক্ষা চালান ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীর পাদুয়া শহরের জনৈক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যাপক, নাম তাঁর স্যাংক্টোরিয়াস। তুলাদণ্ডের একধারে একটি কেদারা স্থাপন ক'রে তিনি তাতে ব'সে তাঁর আহার সমাধা করতেন, অন্যধারে তাঁর আহারের পূর্বেকার দেহের ওজনের সমান ওজন এবং যতটা পরিমাণ খাদ্য তিনি খাবেন তার তুল্য ওজন তিনি চাপিয়ে দিতেন। তুলাদণ্ড যখন তাঁর নিজের দিকে ঝুঁকত তখন তিনি খাওয়া বন্ধ ক'রে উঠে পড়তেন।

আমাদের কার কত বয়স ও কী অবস্থা, কে কী কাজ করি, কে কোন আবহাওয়ায় বাস করি—তার তারতম্যের উপর আমাদের কার কতটা খাদ্য গ্রহণ করা দরকার সেটা নির্ভর করে।

















বিষুবরেখায় অবস্থিত জ্বলন্ত তাপময় দেশে যে ব্যক্তির বাস তার যা খাদ্য দরকার তার চাইতে উত্তর মেরুর সন্নিকটস্থ তুহিন শীতল দেশের লোকের অধিক খাদ্য প্রয়োজন। এমন কি একই দেশে, একই আবহাওয়ায় যে লোক শক্ত কায়িক পরিশ্রম কিম্বা কঠোর মস্তিষ্কচর্চায় নিযুক্ত—তার যা খাদ্য দরকার, একজন অলস ব্যক্তির কিছুতেই ততটা খাদ্য আবশ্যক হ'তে পারে না। সাধারণত, নারীর চাইতে পুরুষের অধিক খাদ্য প্রয়োজন—অবশ্য নারীর গর্ভাবস্থায় এই অবস্থার ব্যতিক্রম

হয়। একজন সবল, কর্মঠ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি যতটা খাদ্য গ্রহণ করে, কোন কোন বিশেষ অবস্থায় বর্ধিষ্ণু বালকবালিকাদেরও ঠিক ততটা খাদ্য প্রয়োজন হয়।

এখন, খাদ্যের পরিমাণ কী ভাবে নির্ণয় করা যায়? একজন মাছভাত দিয়ে খেয়েছে, অন্য আরেকজন তরকারী সহযোগে রুটি দিয়ে খেয়েছে—এদের মধ্যে কে বেশি খেয়েছে কে কম খেয়েছে সেটা কেমন ক'রে আমরা বল্‌বো? এবং যে ব্যক্তি এসব কিছুই না খেয়ে শুধু এক গ্লাস দুধ পান করেছে সে দুজনার চাইতে কম কি বেশি খাদ্য গ্রহণ করেছে তাই বা কী ক'রে জানা যায়? বিজ্ঞান কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর দানের ব্যবস্থা করেছে। আমরা যেভাবে ইঞ্চি, ফুট, গজ ও মাইলের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করি; ছটাক, পোয়া, সের, মণ প্রভৃতির সাহায্যে ওজনের হিসাব করি, কাজের পরিমাণ ঠিক করি অশ্বশক্তির পরিমাপে, ঠিক তেমনি খাদ্যজাত শক্তিকে আমরা ক্যালরির সাহায্যে নির্ণয় ক'রে থাকি। ক্যালরি হচ্ছে সেই সাধারণ মান, বিচিত্র খাদ্যদ্রব্যকে সহজেই যার অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

ক্যালরি জিনিষটি কী? পুষ্টিবিজ্ঞান অনুসারে, ন্যূনাধিক এক সের পরিমাণ জলের তাপ এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড চড়াতে হ'লে যতটুকু উত্তাপ দরকার একটি ক্যালরি ঠিক তার সমান। উত্তাপের পরিমাণ নির্ণয় করবার জন্যে যে যন্ত্রটি তৈরী হয়েছে তাকে বলা হয় ক্যালরিমীটার। কোন একটা বিশেষ খাদ্যের অন্তর্গত ক্যালরির পরিমাণ জান্‌তে হ'লে ক্যালরিমীটারে তাকে খানিকটা পুড়িয়ে নিলেই হ'লো। যে আধারে রেখে খাদ্যকে পোড়ানো হচ্ছে তার চারধারের জলের তাপের ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কতটা উত্তাপ সৃষ্টি হল। আজকাল, এমন জটিল ক্যালরিমীটার যন্ত্র তৈরী হয়েছে যে তার সাহায্যে একটা গোটা

মানুষ কিম্বা পশুকে খাঁচার মধ্যে পূরে তার শরীর থেকে কতটা তাপ বিকিরিত হল তার মাপ নেওয়া যায়।

ক্যালরির দিক থেকে বিভিন্ন খাদ্যের বিভিন্ন খাদ্যমূল্য। একটি বিশেষ ধরণের খাদ্যের বৃহৎ পরিমাণ অংশ থেকে আমরা যতটা সংখ্যক ক্যালরি অর্থাৎ যে-পরিমাণ বল আহরণ করতে পারি, অন্য একটি খাদ্যের অতি স্বল্পপরিমাণ অংশ থেকেও আমরা ঠিক ততটা ক্যালরি সংগ্রহ করতে পারি। এক গ্রামের নয় ভাগের এক ভাগ স্নেহপদার্থে এক ক্যালরি শক্তি বিদ্যমান; এদিকে প্রোটিন কিম্বা শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যের বেলায় এক গ্রামের এক চতুর্থাংশেই ঠিক সমপরিমাণ ক্যালরি পাওয়া যেতে পারে। কাজেই মধ্যাহ্ন কিম্বা নৈশ ভোজনে কত গ্রাম স্নেহপদার্থ আর কত গ্রাম প্রোটিন কিম্বা শ্বেতসারজাতীয় পদার্থ খাওয়া হয়েছে এটা যদি জানা থাকে তা হ'লে স্নেহপদার্থের 'গ্রামকে' নয় দিয়ে আর প্রোটিন ও শ্বেতসারজাতীয় পদার্থের গ্রামকে চার দিয়ে গুণ করলেই হিসাব সহজ হয়ে আসে। এখন, এই দুটি গুণফলকে যোগ করলেই বুঝতে পারবো আমরা কে কতটা খাদ্য গ্রহণ করেছি। কে কী পরিমাণ খেয়েছে অথবা কার কতটা খাওয়া উচিত এইভাবেই সেটা বলা যায়।

বয়স, স্ত্রীপুরুষ ভেদ, অবস্থা অথবা জলবায়ুর তারতম্য, কে কী ধরণের কাজ করি অথবা কতটা পরিমাণ কাজ করি এ সমস্ত বিষয় অনুসারেই আমাদের খাদ্যদ্রব্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন একথা আগেই বলেছি। কাজেই সকলের দেহরক্ষার পক্ষে ক্যালরির পরিমাণ সমান হতে পারে না। একজন কারখানার শ্রমিকের কথাই ধরা যাক্। প্রায় দুই মণ ওজনের একজন সাধারণ মাপের লোক

যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করে তার পূরণের জন্যে তার নিম্নলিখিত হারে খাদ্যগ্রহণ করা উচিত :

	ক্যালরি
ঘণ্টা প্রতি ৬৫ ক্যালরি হিসাবে ৮ ঘণ্টা ঘুম	৫২০
,, ,, ২৪০ ,, ,, ,, ,, কায়িক পরিশ্রম	১৯২০
,, ,, ১৩৫ ,, ,, ,, ,, বিচিত্র কাজ (যথা—চলা, বসা, দাঁড়ানো, মৃদু ব্যায়াম ও বিশ্রাম)	১০৮০
	৩৫২০

যুদ্ধাবস্থায় জার্মাণীতে একজন কারখানার শ্রমিককে দৈনিক ৪,০০০ হাজার ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যের রেশান দেওয়া হয়েছে। যাতে সে তার সাধ্যানুযায়ী পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে কাজ করতে পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। জার্মাণী যখন বেল্‌জিয়ম দখল করেছিল তখন সেখানে মাথাপিছু ৩,৪০০ ক্যালরি পরিমাণ আহার দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবে জানা যায় বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য সেখানে গড়পড়তা ৩,৫০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্য নির্দিষ্ট করা আছে ; সৈন্যরা অবশ্য পায় ৫,৫০০ ক্যালরি।

মাথাপিছু ভারতবাসীর খাদ্যের পরিমাণ কতটা হওয়া উচিত ? মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, দৈনন্দিন কাজের বিভিন্নতা ও পরিমাণ-ভেদে একজন ভারতীয় পুরুষের গড়পড়তা ২,৫০০ থেকে ৩,৫০০ ক্যালরি-পরিমাণ খাদ্য আর একজন ভারতীয় নারীর ২,১০০ থেকে ২,৮০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্য প্রত্যহ প্রয়োজন হয়। মাথাপিছু দৈনিক ২,৬০০ ক্যালরিকে যদি আমরা গ্রহণযোগ্য মান হিসাবে গ্রহণ করি তা হ'লে সেটা যে খুব বাড়িয়ে চাওয়া হ'লো একথা নিশ্চয়ই কেউ বল্‌বেন না। একথা ভুল্‌লে চলবে না যে কলে ছাঁটাই, বিক্রি, ভাঁড়ারজাত করা, রান্না,

খাওয়া ও হজম করার প্রক্রিয়ায় কিছুপরিমাণ খাদ্য অপব্যয় হ'য়ে থাকে। কাজেই, মোটামুটি হিসাবে ২,৮০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করাই সব দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত হবে। এই হিসাবে একজন ভারতীয়ের সম্বাৎসরিক দশলক্ষ ক্যালরির প্রয়োজন হবে। এর অর্থ এই যে আমাদের দেশের বর্তমান যা লোকসংখ্যা সেই চল্লিশ কোটি অধিবাসীর জন্য বৎসরে আমাদের চাই চারশো কোটি লক্ষ ক্যালরি পরিমাণ আহার।

পাঠকরা ভাববেন, 'সে না হয় বোঝা গেল, কিন্তু তাতে কার কি উপকার হ'ল? ব্যক্তিগতভাবে কার কতটা খাদ্য গ্রহণ করা উচিত সেটা তো কই বলা হ'ল না! ক্যালরি তো আর চিবিয়ে খাওয়া যায় না। ক্যালরি বল্‌লেই কেমন যেন একটা বিদ্‌ঘুটে আজব জিনিষের কথা মনে হয়।' সত্যি কথা। এবারে তাই আমরা ক্যালরির আলোচনা বাদ দিয়ে যথার্থ খাদ্যের কথা বল্‌বো—চাউল, আটা, আলু, আম, দুধ, মাংস প্রভৃতি যেসব খাদ্য আমরা নিয়ত খাই তাদের বিষয়ই এবারে আলোচ্য।

৪

আমাদের আহার্য

আমরা এ যাবৎ খাদ্যের বিভিন্ন উপকরণ ও ক্যালরির কথাই সবিস্তারে আলোচনা করেছি। যে সব খাদ্যদ্রব্য থেকে আমরা আমাদের জীবনীশক্তি সংগ্রহ করছি এবারে সেসব খাদ্যদ্রব্যের প্রকারভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। কী কী সেই খাদ্য যা খেয়ে মানুষ বেঁচে আছে? এখানে কেবলমাত্র আমরা প্রধান প্রধান খাদ্যগুলির কথাই বল্‌বো।

এদের চারভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) খাদ্যশস্য, (২) শাকসব্জী ও ফল, (৩) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, আর (৪) মাছ, মাংস ও ডিম।

ভারতবর্ষের খাদ্যতালিকায় শস্য হ'ল সর্বপ্রধান খাদ্য। ভারতের মাটিতে যে সব খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় তার মধ্যে শস্যই প্রধান—দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক কোন না কোন প্রকার খাদ্যশস্য খেয়ে জীবনধারণ ক'রে আছে। এদের অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রধান অথচ পরস্পরবিভিন্ন শস্যের যথাক্রমে নাম হ'ল খাদ্যশস্য (ধান গম প্রভৃতি) এবং দাল।

খাদ্যশস্যের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, ভুট্টা, জই, যব এবং রাগি, জোয়ার, বজ্‌রা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের জনার জাতীয় শস্য। চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় চব্বিশ কোটি লোকের প্রধান খাদ্য হ'ল চাউল—দক্ষিণ ভারত, বেহার, বাংলা, আসাম ও কাশ্মীরের অধিবাসীরাই এর প্রধান ভোক্তা। আর গম হ'ল প্রধানত উত্তর ভারতের লোকদের খাদ্য। বজ্‌রা প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই খাওয়া হয়, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের সঙ্গে চাউল কিম্বা আটা কমবেশি মিশিয়ে নেওয়া হ'য়ে থাকে।

রাসায়নিক উপাদান কিম্বা পুষ্টিকারিতার দিক থেকে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের মধ্যে খুব বেশি তফাৎ নেই। তাদের সকলের মধ্যেই শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, কাজেই ক্যালরির দিক থেকে তাদের প্রত্যেকটিই সমৃদ্ধ। তবে স্নেহপদার্থ তাদের মধ্যে খুব কম। প্রোটিনের অংশও নগণ্য। দুগ্ধ কিংবা মাংস প্রভৃতি জান্তব খাদ্যের মধ্যে প্রোটিনের পরিমাণ খুব বেশি, দাল প্রভৃতির মধ্যে প্রোটিন আছে তবে এতটা নয়—আর খাদ্যশস্যের অন্তর্গত প্রোটিনের পরিমাণ এ দু'য়ের ঠিক মাঝামাঝি। খাদ্যশস্যের ভেতর ক্যালসিয়াম কিম্বা লৌহজাতীয় ধাতব লবণের অংশও সামান্য, যদিও ফসফরাসের অংশ নেহাৎ কম নয়।

বজ্‌রা জাতীয় খাদ্য রাগির মধ্যে কিন্তু ক্যালসিয়ামের পরিমাণ খুব বেশি—চাউলের প্রায় বিশত্রিশ গুণ।

চাউলকে প্রায় আমাদের জাতীয় খাদ্য বলা যায়। অন্যান্য খাদ্যশস্য সব জড়িয়ে যা না খাওয়া হয় একা চাউল তার চাইতে অনেক বেশি খাওয়া হয়। আমাদের শরীর তাজা রাখ্‌বার পক্ষে এটা খুব ভাল ইন্ধন। যখন ক্ষুধার্ত হই, এক থালা ভাত খেলেই আমরা চাঙা হ'য়ে উঠি—মনে হয় পেট ভ'রে গেছে, আর কিছু না খেলেও হয়। তবে দুর্ভাগ্যবশত, শরীরের সবগুলি প্রয়োজন চাউলে মেটানো চলেনা, কেন না চাউল খাদ্যপ্রাণ ও ধাতব লবণ, বিশেষ ক'রে ক্যালসিয়ামের দিক থেকে খুবই দরিদ্র।

গমও প্রায় চাউলের মতনই, তবে কোন কোন দিক দিয়ে চাউলের চাইতে ভাল। সমস্ত খাদ্যশস্যের মধ্যে গমের ভেতরই সব চাইতে বেশি প্রোটিন রয়েছে, আর চাউলে সব চাইতে কম। চাউলের চাইতে গমে ক্যালসিয়ামের ভাগ বেশি, খ খাদ্যপ্রাণের দিক থেকেও গম অধিক সমৃদ্ধ।

আমরা যদি শুধুমাত্র চাউল খেয়ে জীবন ধারণ করতে চাই তা হ'লে শরীরের পক্ষে প্রয়োজন সমস্ত উপাদান আমরা পাবো না। দুর্ভাগ্যবশত, দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের বেশির ভাগ লোকই শুধুমাত্র চাউলের উপর বেঁচে আছে। ধনী শ্রেণীরা অবশ্য অন্যধরণের খাদ্যও কিছু কিছু খায়, কিন্তু সাধারণ লোকদের একমাত্র খাদ্য হ'ল চাউল। গমজীবী উত্তর ভারতের অবস্থা এতটা খারাপ নয়, কেন না অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে তারা দুধ সংগ্রহ করতে পারে আর তাইতে খাদ্য কিছু পরিমাণে পূর্ণাঙ্গ করার সুযোগ তাদের রয়েছে।

দুঃখের বিষয়, এদেশে যে ভাবে চাউল খাওয়া হয় সেটা আদৌ

সন্তোষজনক নয়। আমরা যে চাউল খাই সেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কলে ছাঁটা ভাঙা চাউল—এই প্রক্রিয়াতে প্রোটিন, খাদ্যপ্রাণ ও ধাতব লবণ প্রভৃতি মূল্যবান উপাদানগুলি সহজেই চাউল থেকে বেরিয়ে যায়, আমাদের শরীরের পোষণের পক্ষে কিছুই বাকী থাকে না। এটা কীভাবে ঘটে সেটা দেখাচ্ছি।

চারটি অংশে খাদ্যশস্য তৈরী : আচ্ছাদন বা তুষ, বহিরঙ্গ বা বীজ-কোষ, বীজ বা ভ্রূণ এবং আভ্যন্তরীণ শ্বেতসার-বিশিষ্ট পদার্থ বা শাঁস।

এখানে চাউল বা তণ্ডুল-কণার একটি ছবি দেওয়া হয়েছে। তাতে চারটি অংশকে যথাক্রমে ক, খ, গ ও ঘ এই ভাবে দেখানো হয়েছে। আমাদের খাবার টেবিলে পৌঁছবার আগে একে কোন্ কোন্ অবস্থা পেরিয়ে আস্‌তে হয়েছে সেটা এখন দেখা যাক্।



প্রথমত, আচ্ছাদন বা তুষ (ক) ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। তাতে অবশ্য কোন ক্ষতি হয় না, কেন না তুষ কিছু আহার্য পদার্থ নয়। তবে ভূঁষি হিসাবে গৃহপালিত পশুদের এগুলি খাওয়ানো হয়ে থাকে। আমরা যদি তুষ ছাড়ানোর বেশি আর কিছু না করতুম, এবং সেই অবস্থাতেই চাউল খেতুম—তা হ'লে চাউলের যাবতীয় বলাধান উপকরণই আমরা পেতে পারতুম। ঢেঁকিছাঁটা চাউলে কিন্তু সমস্ত পুষ্টিকর উপাদানই অব্যাহত

থাকে। ভারতে উৎপন্ন চাউলের প্রায় একশো ভাগের সত্তর ভাগ চাউল হাতে ছাঁটা হয়; বাকী সাতাশ ভাগ চাউল কারখানায় চালান দেওয়া হয়, সেখান থেকে বার বার কলে ছাঁটাই হ'য়ে তা বেরিয়ে আসে। ফলে এই হয় যে বীজকোষ (খ) ও বীজ (গ) এই উভয়ই নষ্ট হ'য়ে যায়, বাকী থাকে শুধু ভেতরকার শাঁস (ঘ)। এটা নিতান্তই বোকামি কারণ বিভিন্ন খাদ্যমূল্যের দিক থেকে বীজ ও বীজকোষ শাঁসের চাইতে অধিক সমৃদ্ধ। আমরা কিন্তু সাধারণত শাঁসটুকুই শুধু খাই। শস্য-কণার ভেতরকার ক্রমবর্ধমান ভ্রূণকে লালন করবার জন্যে প্রকৃতি শাঁসের ব্যবস্থা করেছেন, শাঁসটুকু ঠিক আমাদের জন্য উদ্দিষ্ট নয়। কাজেই, শাঁস আমাদের শরীরের বেশি উপকারে আসে না। কল ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়ায় যে সব উপাদান নষ্ট হয় তার মধ্যে রয়েছে কতক পরিমাণে প্রোটিন, সমগ্র ফস্‌ফরাসের প্রায় অর্ধেক ফস্‌ফরাস এবং শতকরা পঁচাত্তর ভাগ খ খাদ্যপ্রাণ।

তবে কলে ছাঁটাইয়ের ফলে যতদূর ক্ষতি হ'তে পারতো কোন একটি বিশেষ কারণে ঠিক ততদূর ক্ষতি হ'তে পারে না, অন্ততঃপক্ষে, ক্ষতি হ'লেও তাকে সাম্‌লে নেওয়া যায়। সেই কারণটি হ'লো ছাঁটাইএর আগে ধান আংশিক ভাবে সিদ্ধ করার প্রথা। এই প্রক্রিয়া আমরা ভারতবাসীরাই শুধু গ্রহণ করেছি। এতে তুষশুদ্ধ ধানকে প্রথমে আগুনে সিদ্ধ করে নিতে হয়। এই ভাবে সিদ্ধ হওয়ার ফলে তুষগুলি নরম হ'য়ে পড়ে এবং তাদের ছাড়িয়ে নেবার পক্ষে সুবিধা হয়। বোধ হয় ঢেঁকি-ছাঁটাইয়ের কাজকে সহজ ক'রে তোল্‌বার জন্যেই এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হ'য়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এর মূল্য তার চাইতেও বেশি। ধান সিদ্ধ করার ফলে সব চাইতে বড় উপকার হয় এই যে বীজ কিম্বা বীজকোষের কতকগুলি মূল্যবান উপাদান—যথা খাদ্যপ্রাণ খ,—ধানের শাঁসের মধ্যে

ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে যখন সেদ্ধ ধান ছাঁটা হয় তখন এই মূল্যবান উপাদানগুলি ভেতরেই থেকে যায়, তারা আর নষ্ট হতে পারে না। আমাদের দেশে উৎপন্ন সমগ্র ধান্যের শতকরা ৫৮ ভাগই এ ভাবে সিদ্ধ হ'য়ে থাকে; ফলে উপকার যে অনেকখানি হয় সে কথা বলাই বাহুল্য। মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ অন্ধ্রদেশের কোন একটি জিলার ঘটনার দিকে তাকালেই বুঝ্‌তে পারবো এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা কত বড় বিপর্যয়ের হাত এড়িয়ে যেতে পারছি। ১৯৩৮ সালে সমগ্র মান্দ্রাজ প্রদেশে সবশুদ্ধ প্রায় তেত্রিশ হাজার বেরিবেরি (আমরা আগেই দেখিয়েছি দেহে খাদ্যপ্রাণ খ-এর অভাব ঘট্‌লেই এই রোগ হয়)-র দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করা হয়, তার মধ্যে বত্রিশ হাজারেরও উপর বেরিবেরির দৃষ্টান্ত ওই এক জিলাতেই ঘটে। এর কারণ আর কিছুই নয়, এই জিলার লোকেরা বরাবরই 'আতপ' চাউল খায়।—অন্য সব জায়গায় কিন্তু সিদ্ধ চাউল খাওয়াই রীতি।

কেবলমাত্র মিলে ছাঁটাইয়ের ফলেই যে চাউলের পুষ্টিমূল্য কমে তা নয়। অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্ন খাদ্য খাওয়ার আগ্রহে আমরা চাউলকে এতবার জল দিয়ে ধুই যে তাতে শতকরা ১০ ভাগ প্রোটিন, ৭৫ ভাগ লোহা ও প্রায় অর্ধেক ফস্‌ফরাস বেরিয়ে যায়। চাউলটি যদি আতপ হয় তা হ'লে একশো ভাগের ষাট ভাগ খাদ্যপ্রাণ খ-ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায়; সিদ্ধ চাউল হ'লে কিন্তু শতকরা আটভাগের বেশি কিছুতেই বেরোতে পারে না। তারপর ভাত যখন হ'য়ে গেলো আমাদের দেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ফেনটি ফেলে দেওয়া হয়। যেটুকু খাদ্যপ্রাণ অবশিষ্ট থাকৃতে পারতো এর ফলে সেটুকুও নষ্ট হয়। এই শেষ অপচয়টুকু সহজেই নিবারণ হয় যদি আমরা অল্পজলে ভাত ফোটাবার অভ্যাস করি।

জলটিকে ভাতের সহিত মিশিয়ে দেওয়া কিম্বা তাকে অন্যভাবে শুষে নেওয়াও সেইসঙ্গে প্রয়োজন।

গম যদি কলে ছাঁটা হয় তাহ'লে ঠিক একই ফল দেখা দেয়। আটার তৈরী রুটি খুবই পুষ্টিকারক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অতিরিক্ত কলে ছাঁটা সাদা আটা (ময়দা)-র তৈরী রুটি খাওয়ার অভ্যাস আমাদের দেশে ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

খাদ্যশস্যের দ্বিতীয় ভাগে পড়ে দাল। খাদ্যমূল্যের দিক থেকে কিন্তু দালের ক্রিয়া অন্যরকম। দেহগঠনের পক্ষে যেসব উপাদান খুব কার্যকরী (যেমন প্রোটিন) সেইসব উপাদানের দিক দিয়ে দাল ধান গম প্রভৃতির চাইতে সমৃদ্ধ। বোধ হয় এইজন্যই দালকে "গরীব লোকের মাংস" বলা হ'য়ে থাকে। কোন কোন খাদ্যপ্রাণের অংশও দালে অধিক। কাজেই, কলেছাঁটা চাউল খাওয়া যাদের অভ্যাস তাদের কিছুটা পরিমাণে দাল অবশ্যই গ্রহণ করা দরকার, বিশেষ ক'রে বালকবালিকাদের এটা নিতান্ত করণীয়। ছোলা অড়হর প্রভৃতি দাল অবশ্য ভারতের সর্বত্রই খাওয়া হ'য়ে থাকে।

আরেকটি রকমফের হ'ল সয়াবিন যা এদেশে এখনও নতুন। এক একর পরিমাণ জমিতে যতটা না ধান হয় সয়াবিন হয় তার চাইতে বেশি। পুষ্টির দিক থেকেও এ খুব মূল্যবান। আটাশটি ডিম কিম্বা সোয়া একসের মাংসের ভেতর যতটা প্রোটিন আছে, আধসের সয়াবিনের মধ্যেই ততটা প্রোটিন আছে ব'লে খাদ্যবিজ্ঞানীরা দাবী ক'রে থাকেন। তা ছাড়া, স্নেহপদার্থের দিক থেকেও এ খুব সমৃদ্ধ; কিছু পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ ক-ও তাতে আছে। সুতরাং, ভাত কিম্বা আটা যারা খায় একটি মূল্যবান পরিপূরক হিসেবে—সয়াবিনকে তাদের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

অঙ্কুরোদ্‌গম হবার পর যদি দাল খাওয়া হয় তবে তাতে খাদ্যমূল্য অনেক বেশি মেলে। অঙ্কুরিত দালের কণায় ও উদ্‌গত সবুজ অঙ্কুরে খাদ্যপ্রাণ গ পাওয়া যায়। কীভাবে তা করতে হয় বলছি। প্রথমে দালগুলিকে চব্বিশ ঘণ্টা যাবৎ ভিজিয়ে রাখুন, তারপর তাদের ভেজা মাটি কিম্বা ভেজা কম্বলের উপর ছড়িয়ে দিন, যখন ছড়িয়ে দেওয়া হল তার উপরে একটি ভেজা কাপড় কিম্বা চটের থলে বিছিয়ে দিন। চটের থলেটিতে কিন্তু মাঝে মাঝে জল ছিটোনো চাই। এইভাবে একদিন কি দু'দিন রাখ্‌লেই দালগুলিতে অঙ্কুর দেখা দেবে। হয় তখন তাদের কাঁচা খাবেন নয় তো খানিকটা সেদ্ধ ক'রে নিয়ে খাবেন—রান্নায় দশ-মিনিটের বেশি সময় নেবেন না।

শাকসব্জী কিম্বা ফল আমাদের দেহে যথেষ্ট ইন্ধন বা শক্তি যোগাতে পারে না। সেই জন্য, শুধুমাত্র শাকসব্জী খেয়ে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কখনও তৃপ্ত হয় না। তবে তাদের একটি বিশেষ ধরণের কাজ আছে—সেটি হ'ল দেহে খাদ্যপ্রাণও ধাতব লবণ সংবরাহ করা। বেশির ভাগ সব্জীর মধ্যেই ক্যারোটিনের আকারে খাদ্যপ্রাণ ক ও গ প্রচুর মেলে—এসব কিন্তু খাদ্যশস্যের ভেতর তেমন পাওয়া যায় না। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ক্লোরাইন প্রভৃতি ধাতব লবণের দিক থেকেও তারা বেশ সমৃদ্ধ। সেইজন্যই দুধ যেমন একটি সমতাবিধায়ক হিতকারী খাদ্য সাকসব্জীও তেম্‌নি। সব্জীর আরেকটি কাজ হল পাকস্থলীকে চালু রাখা। সব্জীর গঠনে যে cellulose আছে তার সাহায্যেই সে এ কাজ ক'রে থাকে। সব্জীর সবটুকু অংশই পুষ্টিকারক নয়, কিম্বা শরীরে জীর্ণও হয় না—কিন্তু পরিমাণ বেশি ব'লে সে সহজেই অন্ত্রগুলিকে নড়িয়ে চড়িয়ে মলনিঃসরণের সুবিধা ক'রে দেয়। এ না হ'লে কোষ্ঠবদ্ধতা হ'তে পারতো।

শাকসব্জী তিনপ্রকার—সবুজ পত্রযুক্ত আনাজ, কন্দও মূল এবং অন্য নানাবিধ তরকারী। এর ভেতর প্রথমোক্ত শ্রেণীকে বলা হয় 'শাক'—তাতে আছে বাঁধা কপি, পালংশাক, ডাঁটা প্রভৃতি। তাদের ভেতর প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ আছে—বিশেষ ক'রে ক্যারোটিনের আকারে খাদ্যপ্রাণ ক এবং খাদ্যপ্রাণ গ যথেষ্টই আছে বল্‌তে হবে। ক্যালসিয়াম সম্পদেও তারা সমৃদ্ধ—দেহের পক্ষে এই ধাতব লবণটি অতি প্রয়োজনীয়। চাউলে ক্যালসিয়াম কম ব'লে ভাত যারা খায় তাদের প্রত্যেকেরই কিছু পরিমাণে সব্জী খাওয়া উচিত। কয়েক বৎসর থেকে পাশ্চাত্য দেশীয়রা, বিশেষ ক'রে আমেরিকার অধিবাসীরা, সবুজ পত্রযুক্ত সব্জী সম্পর্কে খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। চীনদেশের লোকেরা কিন্তু বরাবরই এইদিকে ঝোঁক দিয়ে এসেছে। বাগানজাত তরীতরকারী তারা প্রচুর পরিমাণে খায় এবং এইভাবে দুধ প্রভৃতি জান্তব খাদ্যে যে অপূর্ণতা রয়েছে তাকে পুষিয়ে নেয়।

সব্জী অতিরিক্ত সিদ্ধ করলে কিন্তু খাদ্যপ্রাণ গ আর তেমন পাওয়া যায় না—রান্নার প্রক্রিয়াতে তার অনেকখানি নষ্ট হ'য়ে যায়। অপর পক্ষে, আসিদ্ধ খাওয়ারও অসুবিধা অনেক, তাতে সংক্রমণের ভয় আছে। তাই তাদের বেশ পরিষ্কার ভাবে ধুয়ে তবে খাওয়া উচিত।

কন্দ ও মূল বল্‌তে বোঝায় গোল আলু, মিষ্টি আলু, গাজর, বিট, মূলো ও চুব্‌ড়ি আলু। এদের মধ্যে গোল আলু হ'ল সব চাইতে জনপ্রিয়। গোল আলুর চার ভাগের তিনভাগ হ'ল জল—বাকীটা শ্বেতসার পদার্থ। এতে প্রোটিনের ভাগ সামান্য, তবে এতে এমন কয়েকটি খাদ্যপ্রাণ আছে যাতে অন্য ক্ষতিগুলি পুষিয়ে গেছে। খুব ঘনবসতিযুক্ত দেশের অধিবাসীদের পক্ষে গোলআলু অত্যন্ত মূল্যবান খাদ্য।—কেননা তা সস্তা ও প্রচুর পাওয়া যায়। এক একর পরিমাণ

জমির উৎপন্ন গমে যতগুলি লোকের খাওয়া চলে ঠিক ততটা পরিমাণ জমির আলুতে তার দ্বিগুণ লোককে খাওয়ানো যায়। গাজর, শালগম, ওলকপি প্রভৃতি শিকড়যুক্ত তরকারীও গোল আলুর মতনই গুণযুক্ত। শ্বেতসার ও খাদ্যপ্রাণ গ সম্বন্ধে তারা পুষ্ট কিন্তু প্রোটিনের দিক দিয়ে দরিদ্র। গাজরে অবশ্য ক্যারোটিনও (সম-খাদ্যপ্রাণ ক) বেশ পাওয়া যায়।

অন্যবিধ তরকারীর মধ্যে আছে বেগুন, ধুঁধুলা, ঢেঁড়স প্রভৃতি।

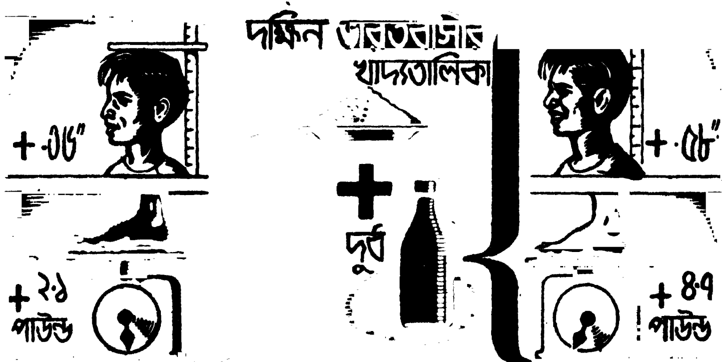
তরকারীর সঙ্গে ফলাদির সাধারণভাবে বেশ মিল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ফল তরকারীর মতনই খাদ্যপ্রাণ ও ধাতব লবণের যোগান দিয়ে থাকে। কমলা লেবু, জামীর প্রভৃতি ফল খাদ্যপ্রাণ-গ সম্পদে বিশেষ-ভাবে সমৃদ্ধ। তাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে লোহার ভাগও রয়েছে। তবে অবশ্য, সর্বাঙ্গীন খাদ্য ফল নয়, এবং শুধু ফল খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করাটাও অনুচিত। দৈনিক একটি করে আপেল খেলে ডাক্তার বাড়ির কাছ ঘেঁস্‌তে পারে না এ কথা হয়ত সত্য, কিন্তু ঝুড়ি ঝুড়ি আপেল খেলাম **আর কিছুই খেলাম না** এতে ডাক্তারকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

প্রায় সবগুলি উপাদানই রয়েছে এমন কোন সর্বাঙ্গীন খাদ্য যদি থেকে থাকে তো সে হচ্ছে দুধ। দুধে মূল্যবান প্রোটিন সম্পদ রয়েছে, আর আছে স্নেহপদার্থ, কার্বোহাইড্রেট, ক, খ, গ ও ঘ পর্যন্ত সবগুলি খাদ্যপ্রাণ আর ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস প্রভৃতি ধাতব লবণ।

শিশু ও বর্ধিষ্ণু বালকবালিকাদের পক্ষে দুধ বিশেষ ভাবে মূল্যবান। গরু, মোষ কিম্বা ছাগলের দুধ—যা সচরাচর আমরা শিশুকে খেতে দিই—খাদ্যসম্পদে মাতৃদুগ্ধের মতন না হ'লেও মাই ছাড়াবার পর শিশুর পক্ষে সেইটেই হচ্ছে মাতৃদুগ্ধের কাছাকাছি একমাত্র খাদ্য।

শিশু জন্ম থেকে নেক্‌ড়ে বাঘের দুধে মানুষ হয়েছে এরূপ গল্পও কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রোমনগরীর স্রষ্টা রম্যুলাস ও রেমাস এবং কিপ্‌লিং-এর Jungle Book-এর মৌগলির নাম করা যেতে পারে। আজকাল কৃত্রিম মিশ্রণের প্রক্রিয়ায় মাতৃদুগ্ধের ন্যায় দুধ তৈরী করবার প্রচেষ্টা চল্‌ছে—মাতৃদুগ্ধের যা যা উপাদান এতেও তাই থাক্‌বে।

শুধু যে শিশুরাই দুধের উপর নির্ভরশীল তা নয়। স্কুলের ছেলেদের পক্ষেও দুধ দরকার। স্কুলের ছেলেরা সচরাচর যা খায় তার সঙ্গে দুধ যোগ ক'রে দেখা গেছে তাতে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। এটা পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে, পরীক্ষিত হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে, দক্ষিণ ভারতের কুনুরের নিকটবর্তী কোনও এক জায়গার কতকগুলি শিশুকে Nutritional Research Laboratories এর লোকেরা পরীক্ষা করেন। তিন মাসে এই পরীক্ষা শেষ হয়। ছেলের দলকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়—প্রথম দলের ছেলেদের শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতীয় খাদ্য খেতে দেওয়া হয় আর অন্য



দলের বেলায় ঠিক একই খাদ্যের ব্যবস্থা হয় কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে রোজ এক পো ক'রে মাখন তোলা দুধ জুড়ে দেওয়া হয়। এখানে বলা দরকার যে দুধ থেকে মাখন তুলে নেবার সময় স্নেহ এবং কিছু পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ ক নষ্ট হয়ে যায়! সে যাই হোক্, তিন মাস পরে দেখা গেল, প্রথম দলের ছেলেরা এই সময়ের মধ্যে মাথায় যেখানে মাত্র ·৩৬ ইঞ্চি বেড়েছে দ্বিতীয় দলের ছেলেরা সেখানে বেড়েছে ·৫৮ ইঞ্চি। ঠিক একই ভাবে, প্রথমোক্ত দলের ছেলেদের ওজন যেখানে গড়পরতা একসেরের কিছু বেশি বেড়েছে দ্বিতীয় দলের ছেলেদের ওজন সেখানে বেড়েছে প্রায় আড়াই সেরের কাছাকাছি।

ঠিক এই জন্যই ইংল্যাণ্ডে কয়েক বৎসর যাবৎ স্কুলের ছেলেদের জন্যে দৈনিক দুধ বরাদ্দ করা হয়েছে। খুব অল্প মূল্যে অথবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই এই দুধ পাওয়া যায়। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে যেসব স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান শিশুদের বিনামূল্যে দুধ খাওয়ানোর কাজে জনসাধারণের টাকা খরচ করে, শেষ পর্যন্ত তাঁরা তার থেকে যে উপকার লাভ করেন অন্য কোন ভাবে টাকা খরচ ক'রে সেই উপকার কিছুতেই লাভ করা যেতে পারতো না।

মাছ, মাংস ও ডিম পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চলের লোকদের নিত্ত-নৈমিত্তিক খাদ্য। বিশেষত, ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চল ও আমেরিকায় এদের ব্যবহার খুব বেশি। আমাদের দেশেও এই খাদ্যগুলি চলে, তবে তেমন বহুলভাবে নয়। ভারতবর্ষ মুখ্যত নিরামিষভোজী দেশ ব'লে এখানে এদের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম।

কারণ এর একটা নিশ্চয়ই আছে। পৃথিবীর সর্বত্রই অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এক একর পরিমাণ জমিতে গরু, ভেড়া, হাঁস বা মুরগী প্রতিপালন ক'রে মাংসের আকারে যে খাদ্য সংগৃহীত হয় তা দিয়ে

যতো লোককে খাওয়ানো চলে, ঠিক একই পরিমাণ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন ক'রে তার চাইতে অধিক লোককে খাওয়ানো সম্ভব। এইভাবে দেখা যায়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এক একর জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করলে যেখানে একশো একক পরিমাণ খাদ্যমূল্য লাভ করা যায়, দুধ উৎপাদন করলে সেখানে পাওয়া যায় মোটে চল্লিশ একক, ভেড়ার মাংস থেকে আসে আট একক আর যদি জমিটিতে হাঁসমুরগী প্রতিপালন করা যায় তা হ'লে তাদের ডিম থেকে পাওয়া যায় মোটে ছয় একক। সুতরাং ভারতবর্ষের মতন ঘনবসতিযুক্ত দেশের পক্ষে খাদ্যশস্য উৎপাদন করাই যে সব চাইতে বিবেচনার কাজ সেকথা বোধ হয় না বললেও চলে। ভারতবর্ষের নিরামিষাশী হওয়া ছাড়া বল্‌তে গেলে গত্যন্তর নেই। এর উপর রয়েছে হিন্দুত্বের সংস্কার—হিন্দুশাস্ত্রের বিধানে মাংস খাওয়া নিষেধ। এদিকে প্রাণিবধে হিন্দু পরাঙ্মুখ, এ থেকে এমন এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে আমাদের দেশে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। এরা হয়ত তেমন খেতে পায় না, তা হ'লেও ভূমিজাত খাদ্যের অনেকটা অংশই এরা উদরসাৎ করে।

ভেড়ার মাংস কিম্বা অন্যবিধ মাংস হয়ত উত্তম খাদ্য, তাতে প্রোটিনও যথেষ্ট থাকে, কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় তারা কখনই উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করতে পারবে ব'লে মনে হয় না।

মাছের বেলায় অবশ্য এই আপত্তি টেঁকে না। আমাদের দেশের বিস্তৃত উপকূল ভাগের চতুর্দিকস্থ সমুদ্রে এবং নদীতে প্রচুর মাছ। হাত বাড়ালেই তাদের পাওয়া যায়।

টাট্‌কা অথবা শুক্‌নো যে কোনো অবস্থাতেই মাছ একটি মূল্যবান

খাদ্য। এতে একদিকে যেমন যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন রয়েছে অন্য দিকে তেমনি খাদ্যপ্রাণ ক ও ঘ এবং ফসফরাসও যথেষ্ট। ছোট ছোট

মাছ থেকে ক্যালসিয়ামও পাওয়া যায় যদি তা আমরা টুকরো টুকরো করে না খেয়ে পুরোটা একসঙ্গে খাই। ভাত যাদের প্রধান খাদ্য

তাদের খাদ্যতালিকায় ঠিক এই কয়টি উপকরণেরই অভাব। সেইজন্যে, ভারতবাসীর পক্ষে মাছের প্রয়োজন অপরিহার্য।

কড্ ও হাঙরের যকৃতের তেলের মতন মাছের যকৃতের তেলেও অনেকখানি ভেষজগুণ আছে ব'লে জানা যায়। খাদ্যপ্রাণ ক ও ঘ, যা সাধারণ খাদ্যবস্তুতে প্রায়ই মেলে না, এর ভেতর তা কেন্দ্রীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়।

জান্তব আরেকটি মূল্যবান খাদ্য হ'ল ডিম। কেউ কেউ মনে করেন উৎকৃষ্ট সর্বগুণাধার খাদ্য হিসাবে দুধের পরেই ডিমের স্থান। দুধ যেমন শিশুর দেহের সমস্ত খাদ্যোপকরণ যোগায় ডিমও তেমনি পক্ষিশাবকের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যের যোগান দেয়। দুধের চাইতে ডিমে খাদ্যপ্রাণ ক ও লোহার ভাগ বেশি। আবার ক্যালসিয়ামের দিক থেকে ডিমের চাইতে দুধ অধিক মূল্যবান। সে যা হোক, আমরা আগেই দেখিয়েছি ডিম অত্যন্ত মহার্ঘ খাদ্য। শক্তির উৎস হিসেবে ডিমের মূল্য সেই অনুপাতে তা খুব সুলভ নয় এইটেই যা দুঃখের।

৫

সর্বগুণাধার পথ্য

বই ও প্রবন্ধাদিতে আমরা প্রায়ই সর্বগুণাধার পথ্যের (balanced diet) উপযোগিতার বিষয় প'ড়ে থাকি। আসলে 'সর্বগুণাধার পথ্য' বলতে কী বোঝায়? আমাদের দেহের পক্ষে দৈনিক কতটা আহার্য দরকার এবিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু ভাত, মাংস কিম্বা চিনি যাই ধরি না কেন, যে কোন এক ধরণের খাদ্য সম্পূর্ণ পরিমাণ খাওয়াতে সেই সমস্যার সমাধান হয় না। একজন ইংরেজ ডাক্তার একমাস যাবৎ শুদ্ধমাত্র চিনির পথ্যের উপর জীবনধারণ করতে গিয়ে নিজের

পরীক্ষায় নিজে মারা যান। অথচ সেই খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ প্রয়োজনের অনুরূপই ছিল! সেইজন্যেই আবশ্যক পরিমাণ খাদ্য বিভিন্ন ধরণের আহার্যের মধ্যে এমন ভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া উচিত যাতে প্রোটিন, স্নেহ, শর্করা, ধাতব লবণ, খাদ্যপ্রাণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি মূল্যবান খাদ্যোপকরণই উপযুক্ত পরিমাণে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। যে পথ্যে এইভাবে বিভিন্ন আহার্যের মধ্যে খাদ্যাংশ বণ্টন ক'রে দেওয়া হয় তাকেই বলা হয় সর্বগুণাধার পথ্য।

পুষ্টিবিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, সর্বগুণাধার পথ্য সম্পর্কে তাঁদের এক এক জনের এক এক মত। এবিষয়ে ব্রিটিশ স্বাস্থ্যমন্ত্রিদপ্তরের পরামর্শদাতা পরিষদের অভিমত অনুধাবন ক'রে দেখা যাক্। এই পরিষদ থেকে যে পথ্য অনুমোদন করা হয়েছে তাতে থাক্‌বে ৩,০০০ ক্যালরি আর সেটা তৈরী হবে এইভাবে: ১০০ গ্রেণ প্রোটিন, তার একতৃতীয়াংশ আবার জন্তুজাত হওয়া চাই; ১০০ গ্রেণ স্নেহ; ৪০০ গ্রেণ শর্করা ও শ্বেতসার; তা ছাড়া ধাতব লবণ ও খাদ্যপ্রাণেরও একটা বিশেষ পরিমাণ তাতে থাক্‌বে।

নিচের তালিকায় তিনটি সর্বগুণাধার পথ্যের হিসাব দেওয়া হয়েছে। প্রথম কলমের হিসাবটি খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিগুলির যে অধিবেশন হয়েছিল তার রিপোর্ট থেকে নেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে একে আদর্শ পথ্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে—এটাকে তাই আমরা আমাদের আলোচনার মূল লক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। দ্বিতীয় কলমে একটি সর্বগুণাধার নিরামিষ পথ্যের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এখানকার পুষ্টিবিশেষজ্ঞরা এটাকে ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী ব'লে মনে করেন। তৃতীয় কলমে ঠিক তারই সঙ্গে সমতা রেখে একটি আমিষ পথ্যের হিসাব দেওয়া হয়েছে।

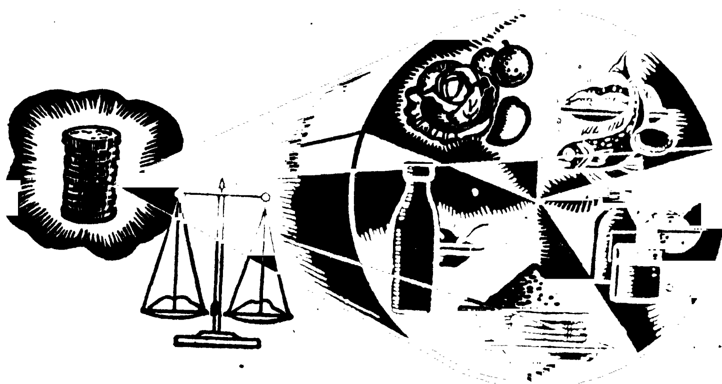
	আন্তর্জাতিক (সম্মিলিত জাতি-সম্মেলন)	ভারতীয় নিরামিষ	ভারতীয় আমিষ
	আউন্স	আউন্স	আউন্স
চাউল প্রভৃতি শস্যকণা (নির্দিষ্ট পরিমাণ গম সহ)	১০·০	২০·০	২০·০
দাল ...	...	৩·০	৩·০
শাকসব্জী (মূল ও কন্দ)	৮·০	১২·০	৮·০
„ (অন্যবিধ, সবুজপত্রযুক্ত)	৮·৪		
ফল ...	৫·০	২·০	২·০
স্নেহ ও তৈলপদার্থ	২·৬	২·০	১·০
দুধ ...	২১·০	৮·০	৮·০
শর্করা ...	১·৫	২·০	২·০
মাংস, মাছ ও ডিম	৫·০	...	৪·০
মোট	৬১·৫	৪৯·০	৪৮·০
অপব্যয় (শতকরা ৫ ভাগ) বাদ দিয়ে ...	৩·০	২·৫	২·৫
সর্বসাকুল্যে	৫৮·৫	৪৬·৫	৪৫·৫

এ থেকে দেখা যাবে যে সম্মিলিত জাতি-সম্মেলন কর্তৃক উদ্ধৃত পথ্য অন্য দুটি পথ্য থেকে খাদ্যমূল্যের দিক দিয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। তাতে বৈচিত্র্য ও সামঞ্জস্য ও বেশি। এর কারণ বোধ হয় এই যে ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় আমাদের অতোটা পরিমাণ খাদ্য না হ'লেও চলে—স্বভাবতই শীতের দেশের লোকদের খাদ্যের পরিমাণ আমাদের চাইতে বেশি হবে। তা ছাড়া, আমাদের শরীরের গঠন অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও জিরজিরে। বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন জাতির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সম্মিলিত জাতি সম্মেলনের খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে—সেটা কোন এক বিশেষ জাতির পথ্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর

উপযোগী আদর্শ পথ্য। তাই আমাদের চোখে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই তাকে বেশি গুরুভার ব'লে মনে হচ্ছে। গুরুতর বৈষম্যের আরেকটা কারণ হ'ল এই যে বহুদিন ধ'রে দায়ে প'ড়ে ভারতবাসী এমনই কম খেতে খেতে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছে যে যাঁরা আমাদের ভাবনা ভাবেন তাঁরা আমাদের উপযোগী পথ্য বাৎলাবার বেলায় স্বভাবতই আমাদের প্রয়োজনকে কম ক'রে ধরেন!

জনৈক আমেরিকাবাসী খাদ্য-বিশেষজ্ঞ পথ্য সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়েছেন সেইটে গ্রহণ করাই বোধ হয় সর্বগুণাধার পথ্যনির্ণয়ের সব চাইতে সহজ উপায়। তাঁর মত এই:

> খাদ্যকে পাঁচভাগে ভাগ ক'রে নাও;
> তার এক-পঞ্চমাংস শাকসব্জী ও ফলের জন্যে রাখ;
> এক-পঞ্চমাংশ রাখ দুধ, মাখন, পনীর ও ঘি-এর জন্যে;
> মাছ মাংস ডিমের জন্যে চাই এক-পঞ্চমাংশ;
> আর এক-পঞ্চমাংশ রাখ্‌তে হবে চাউল আটা প্রভৃতির জন্যে;
> বাকী এক-পঞ্চমাংশ স্নেহ, শর্করা, মসলা ও অন্যবিধ আহার্যের জন্যে রাখাটাই বিধেয়।



ভারতীয় খাদ্য

কী ধরণের খাদ্য খাওয়া উচিত এযাবৎ আমরা সেকথাই বলেছি। আজকের দিনে সেই খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর কিনা সে সম্বন্ধে আমরা মাথা ঘামাই নি। বলতে গেলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মেঘের উপর দিয়ে ভেসে চলেছিলাম, এবারে রুক্ষ পৃথিবীতে নেমে আসা যাক্। জাতি হিসাবে আমাদের কতদূর খাওয়া উচিত সেকথা তোলা রইল, আপাতত দেখা যাক্ জাতি হিসাবে বাস্তবিক আমরা কতদূর খাই। এই আলোচনার অর্থ শক্ত ধাক্কা খাওয়া—অসমান জমির উপর এরোপ্লেন নাম্‌তে গিয়ে যেরকম ধাক্কা খায় সেই ধরণের ধাক্কা। তা হ'লেও তাকে এড়াবার উপায় নেই। বাস্তবের মুখোমুখি আমাদের হ'তেই হবে।

ভারতবর্ষ প্রধানত নিরামিষভোজী দেশ একথা আমরা আগেই বলেছি। এমন কি, মাংস খাওয়া সম্বন্ধে যাদের ধর্মীয় কিম্বা অন্য কোনরূপ বাধা নেই তারাও কার্যত নিরামিষভোজী। এর কারণ আর কিছু নয়, মাংস কিম্বা ডিমের চাইতে খাদ্যশস্য জন্মানো স্বভাবতই অল্প ব্যয়সাধ্য এবং সেই হেতু সস্তা। সমুদ্রের উপকূলভাগে মাছ খুব অল্পায়াসে সংগ্রহ করা যায়; সেইজন্য সেই সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা নিরামিষ খাদ্যের সঙ্গে কিছুপরিমাণে মাছও খেয়ে থাকে।

পরের পৃষ্ঠায় তিনটি বিশেষ বিশেষ পথ্যের হিসাব দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমটি হ'লো দক্ষিণ ভারতীয় খাদ্য—গরীবগরবা শ্রেণীর প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা এই খাদ্য খায়। দ্বিতীয় কলমে রয়েছে উত্তর

ভারতের দরিদ্র শ্রেণীর প্রাপ্তবয়স্কদের আহার্যের তালিকা। তৃতীয় কলমে আছে বোম্বাই সহরের নিম্নমধ্যবিত্ত গুজরাটিদের আহার্যের হিসাব ঃ



	আউন্স	আউন্স	আউন্স
চাউল ...	১৬˙০	.২˙৫	৩˙৭
গম ...	...	১৪˙৯	৫˙১
যোয়ার ...	...	...	১˙৫
দাল ...	১˙০	১˙৪	২˙২
শাকসব্জী ...	২˙৫	৬˙৭	৫˙৬
দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি (ঘি সহ)	১˙৫	৩˙৪	১০˙৮
স্নেহ ও তৈল ...	০˙৫	...	১˙০
চিনি ও গুড় ...	...	০˙৯	১˙৬
আচার মোরব্বা প্রভৃতি	০˙৫	০˙২	০˙৫
মাছ, মাংস ও ডিম	...	০˙৫	...
মোট ...	২২˙০	৩০˙৫	৩২˙০
শতকরা ৫ ভাগ অপচয় বাদ দিলে	১˙০	১˙৫	১˙৫
সর্বসাকুল্যে ...	২১˙০	২৯˙০	৩০˙৫
ক্যালরি ...	১৮২০	২১৮০	১৯৬০

এই তিনটি তালিকা পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে দক্ষিণ ভারতীয় খাদ্যে চাউলই প্রধান। তেম্নি, উত্তর ভারতীয় খাদ্যের তালিকায় গমের প্রাধান্য স্পষ্টতই চোখে পড়ে। বোম্বাই সহরের গুজ্‌রাটিদের খাদ্য মিশ্র জাতীয়, কেননা এতে চাউল ও গম দুইই রয়েছে আর আছে কিছু পরিমাণ দুধ ও দুধের তৈরী জিনিষের ব্যবস্থা যা অন্য দুটি খাদ্যতালিকার আওতার বাইরে। খানিকটা ভৌগলিক সংস্থানের জন্যেই এরকম হয়, তবে অন্য দুইশ্রেণীর লোকদের চাইতে গুজ্‌রাটিদের অবস্থা ভালো সেটাও একটা কারণ। খাদ্যের উপর আয়ের প্রভাবের কথা আমরা পরে বল্‌বো।

আগের অধ্যায়ে আমরা সর্বগুণাধার পথ্যের যে মান বেঁধে দিয়েছিলাম তার সঙ্গে মিলিয়ে হিসাব করলে উপরোক্ত তিনটি তালিকার একটিও টেঁকে না। ৩৮ পৃষ্ঠায় দেখতে পাবেন আমিষ নিরামিষভোজী এই উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যেই দৈনিক মোট ৪৬ আউন্স খাদ্যের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত খাদ্যতালিকায় দেখুন মোট খাদ্যের পরিমাণ ২০ থেকে ৩০ আউন্সের বেশি হয় না। এদের মধ্যে যেটি সবচাইতে ভালো, শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় আহার্যের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ খাদ্য তাতে পাওয়া যায়, বাকী দুটিতে তারও চাইতে অনেক কম। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পর্যাপ্ত এবং সর্বগুণাধার পথ্য গ্রহণ করবার পথে আমাদের এখনও অনেকখানি যেতে হবে, সাধারণ ভারতবাসী তবে যদি যথেষ্ট পরিমাণে খেয়ে বাঁচতে পারে। অবশ্য, সম্মিলিত জাতির খাদ্যবিষয়ক অধিবেশনের রিপোর্টে যে আদর্শ খাদ্য-তালিকা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে যদি আমরা উপরোক্ত তিনটি খাদ্যের তালিকা তুলনা করি পার্থক্যটা এতই চোখে লাগে যে হৃদয় হতাশায় ভ'রে ওঠে।

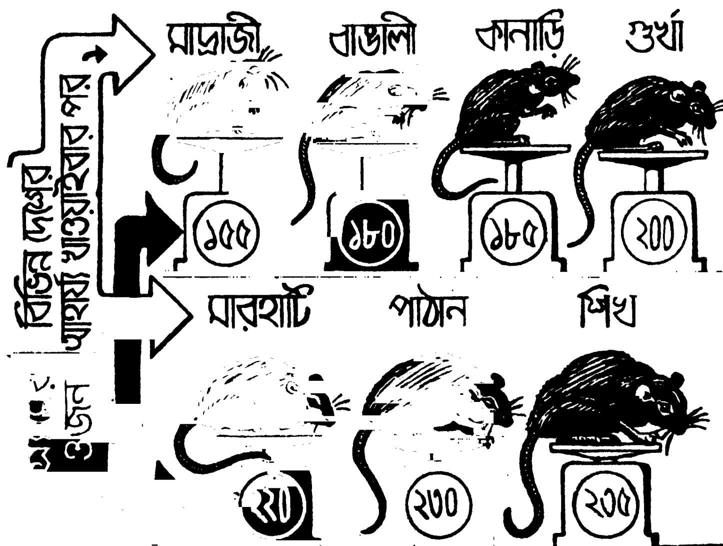
এই তালিকাগুলির দিকে লক্ষ্য করলে এবং আগের অধ্যায়ের তালিকার সঙ্গে তাদের তুলনা করলে আমরা আরও একটি জিনিষ শিখ্‌তে পারি, সেটি হচ্ছে এই যে আমরা যে শুধু কম খাই তা-ই নয়, আমাদের খাদ্যের বেশি পরিমাণই বিশেষ এক ধরণের খাদ্যের সমষ্টি এবং তাতে অন্যান্য ধরণের খাদ্যের পরিমাণ খুবই কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দক্ষিণ ভারতের খাদ্যে চাউলের ভাগ অতিরিক্তমাত্রায় বেশি। তেম্নি, আমাদের সমস্ত পথ্যেই শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যের অংশ প্রচুর, যেহেতু তা সুলভ। কিন্তু এ সব খাদ্যে প্রোটিন প্রভৃতি দেহগঠনের সহায়ক খাদ্যগুণবিশিষ্ট উপাদানের একান্তই অভাব—খাদ্যপ্রাণ এবং ধাতব লবণ প্রভৃতি দেহনিয়ন্ত্রণকারী খাদ্যবস্তুর দিক দিয়েও তারা অত্যন্ত দরিদ্র। এর কারণ আমাদের পথ্যে মাছমাংসের ভাগ নিতান্তই কম, দুধের অংশ অকিঞ্চিৎকর, ফল ও শাকসব্জীর ভাগ তো একেবারেই সামান্য। ভারতবাসীদের শাকান্নভোজী বলা হয় সত্য কিন্তু প্রয়োজনীয় শাকসব্জীর অর্ধেকও তারা জুটিয়ে উঠ্‌তে পারে না—একে নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা ছাড়া আর কী বলা যায়?

দুধের অভাবটাই সবচাইতে বেশি মারাত্মক। এই দিক দিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় পথ্যের চাইতে উত্তর ভারতীয় পথ্যের অবস্থা অনেকটা ভাল। ১৯৪৩ সনের দুগ্ধ ক্রয়বিক্রয়ের রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ ক'রে আমরা হিসাবটি দিচ্ছি। বিভিন্ন প্রদেশে দুধ ও দুধের তৈরী জিনিষ (মাখন, ঘি প্রভৃতি) দৈনিক মাথাপিছু কতো আউন্স ক'রে খাওয়া হয় তার হিসাব এখানে পাওয়া যাবে:

সিন্ধু	...	১৮·০	হায়দরাবাদ	...	৩·৯
পাঞ্জাব	...	১৫·২	মাদ্রাজ	...	৩·৭
সংযুক্ত প্রদেশ	...	৭·০	উড়িষ্যা	...	৩·৪

উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ		৬'৮	বাংলা	...	২'৮
বোম্বাই	...	৫'৫	মধ্যপ্রদেশ	...	১'৮
মহীশূর	...	৪'৪	আসাম	...	১'৬
বিহার	...	৪'২			

দুগ্ধবিতরণের ক্ষেত্রে এই অসাম্য এবং চাউল ও গমপ্রধান খাদ্যের মধ্যেকার পার্থক্যের দরুণই উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের লোকদের দেহগঠনে এতদূর পার্থক্য চোখে পড়ে। কয়েক বৎসর আগে



কুকুরের খাদ্যবিষয়ক গবেষণাগারের তদানীন্তন ডাইরেক্টর সার রবার্ট ম্যাক্‌কারিসন অনেকগুলি ইঁদুর সংগ্রহ ক'রে তাদের কয়েকটি আঞ্চলিক বিভাগে ভাগ করেন। একটি দলকে বিশুদ্ধ শিখ পদ্ধতির খাদ্য

খাইয়ে রাখা হয়; আরেক দলকে খাওয়ানো হয় মহারাষ্ট্রীয় খাদ্য, অপর একটি দলকে শুধু মান্দ্রাজী খাদ্যের উপর জীইয়ে রাখা হয়—এইভাবে যতোগুলি অঞ্চলের খাদ্যব্যবস্থা তিনি পরীক্ষা করবেন বলে স্থির করেছিলেন ইঁদুরগুলিকে তিনি সেই সেই অঞ্চলের খাদ্যোপকরণ খাওয়াতে থাকেন। তার ফল কী দাঁড়ালো আগের পৃষ্ঠার ছবিটিতে তার একটি হিসাব দেওয়া হয়েছে। গ্র্যামের হিসাবে বিভিন্ন দলের ইঁদুরদের গড়্পরতা ওজনের পরিমাণ তাতে পাওয়া যাবে। আমরা যদি ঐ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের গড়পরতা ওজনের হিসাব নিতে চেষ্টা করি তা হ'লে দেখবো, তাদের লেবেল আঁটা বিভিন্ন দলের ইঁদুরদের ওজনের মধ্যে যে তফাৎ তাদের নিজেদের মধ্যেও প্রায় সেইরূপ ওজনেরই তফাৎ! তার কারণ ইঁদুর প্রায় আমাদের মতনই সর্বভুক্ প্রাণী—অর্থাৎ, যা তার খেতে ভালো লাগে তার সবকিছুই সে খেতে প্রস্তুত! ইঁদুরের পরিপাকযন্ত্রের সঙ্গেও আমাদের পরিপাকযন্ত্রের সুগভীর মিল রয়েছে। ইঁদুরের আয়ুষ্কাল মোটে তিন বৎসর, কাজেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করা যতো সহজ আমাদের বেলায় সেটা ততো সহজ নয়। সেই জন্যেই গবেষণাকারীদের কাছে ইঁদুর খুব প্রিয়—তাঁদের অনেক পরীক্ষাতেই এর ডাক পড়ে। শুঁয়া পোকাও অনেক সময় পরীক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়। তার থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রাণীর মধ্যেকার গূঢ় ঐক্যের কথাটাই যেন আমাদের বিশেষ ক'রে মনে প'ড়ে যায়।

৭

আমাদের সরবরাহ ও ঘাট্‌তি

আমাদের দেশের অধিবাসীদের যে ধরণের সর্বগুণাধার ও পর্যাপ্ত পথ্য দরকার, বর্তমানপ্রচলিত সাধারণ ভারতীয় পথ্য যে তা থেকে অনেক বিভিন্ন সেকথা আমরা বুঝিয়েছি। জনসাধারণের অজ্ঞতা অথবা বিপথগামিতাই যে এর একমাত্র কারণ তা নয়। ঠিক ঠিক জিনিষ আমরা কেন খাই না অথবা যা খাই তা কেন যথেষ্ট পরিমাণে খাইনা এর নিশ্চয়ই আরো সুগভীর কারণ আছে। এ বিষয়ে সঠিক উত্তর হয়ত পাবো যদি খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহের ব্যাপারটিকে ভালো ক'রে তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি এবং আমাদের চাহিদার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখি।

খাদ্যদ্রব্যের বিষয়ে ভারতবর্ষ বল্‌তে গেলে সম্পূর্ণত নিজের উপর নির্ভরশীল। ইংলণ্ড এবং অন্যান্য অনেক দেশের কিন্তু এ অবস্থা নয়; খাদ্যদ্রব্যের একটা মোটা অংশের জন্য তাদের ভিন্ন দেশের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাক্‌তে হয়। আমরা ভারতবাসীরা অপর দেশ থেকে যা কিনি অথবা তাদের কাছে যা বিক্রি করি তার পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য। একথা সত্য যে যুদ্ধ বাধবার আগে আমরা ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও ইন্দো-চীন থেকে কিছু পরিমাণ চাল আনাতাম। কিন্তু হিসাব নিলে দেখা যাবে, সেই আম্‌দানীর পরিমাণ আমাদের গোটা চাউলের পরিমাণের শতকরা চার পাঁচভাগের বেশি নয়। বাকী সবটাই আমরা নিজেরা জন্মাতাম। তেমনি রপ্তানীর বেলায়ও আমরা মোটে শতকরা একভাগ চাউল ও তিনভাগ গম বাইরে পাঠাতাম। বাইরে থেকে অবশ্য টিনে ভর্তি হ'য়ে আচার, মোরব্বা, পনীর, সর, কুল ও পীচ্ ফল আমাদের দেশে আসে।

কিন্তু আমাদের খাদ্যসমস্যার বিরাটত্বের তুলনায় তাদের পরিমাণ এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাদের হিসাব নেওয়ার প্রয়োজন দেখি না। তা ছাড়া, মুষ্টিমেয় ধনীরাই শুধু বিদেশী টিনের খাবার কিন্‌তে পারে, সাধারণের চাহিদার সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই। সে যাই হোক, আমাদের আমদানীর পরিমাণ যা রপ্তানীর পরিমাণও তা—তাই সামান্য হ'লেও পরস্পরে কাটাকুটি হ'য়ে কিছুই থাক্‌ছে না। কাজেই আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, খাদ্যসংস্থানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ বল্‌তে গেলে নিজের সীমার মধ্যেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ। দুর্ভাগ্যবশত, তা থেকে এই বোঝায় না যে আমাদের দেশ স্বয়ং-নির্ভরশীল। দুটো কথায় তফাৎ আছে। এবং সেটাই এখানে বল্‌বো।

আমাদের খাদ্যসরবরাহের সঠিক হিসাব নিতে হ'লে বিভিন্নধরণের খাদ্যবস্তু আমরা কী পরিমাণ জন্মাই তার খোঁজ নেওয়া দরকার। কিন্তু মুস্কিল এই যে এ বিষয়ে আমাদের হাতে তথ্য খুবই কম এবং যাও আছে তাও মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। একথা স্বীকৃত যে সরকারের তরফ থেকে যে হিসাব দেওয়া হয় তা খুব নির্ভুল হিসাব নয় এবং অনেকক্ষেত্রে তা একেবারেই সঠিক তথ্যের কাছ দিয়ে যায় না। দেশে কতটা ধান অথবা গম উৎপন্ন হয়েছে একথা যখন ভারতসরকারের জানা দরকর হয়, তাঁরা করেন কি প্রতি একরজাত গড়পরতা শস্যের পরিমাণকে সেই শস্যের সমগ্র জমির পরিমাণ দিয়ে পূরণ করেন। কিন্তু এই দুটো ব্যাপারই অস্পষ্ট। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে কোন্ শস্যের বাবদ কতটা পরিমাণ জমি আবাদ হয় তা মোটামুটিভাবে মাত্র জানা আছে। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যে সে বালাইও নেই। কোন্ শস্যের জন্য কতটা পরিমাণ জমি চাষ হচ্ছে সে সম্বন্ধে সেখানকার লোকদের কণামাত্র ধারণা আছে ব'লেও মনে হয় না।

ফলে সরকারের প্রদত্ত তথ্য থেকে আমরা কেবলমাত্র দেশের দুইতৃতীয়াংশ অঞ্চলের খবর পাই। অবশিষ্টাংশের জন্য অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। সরকার যখন প্রতি একর হিসাবে কোন বিশেষ ফসলের পরিমাণ জান্‌তে চান অবস্থা তখন আরও শোচনীয় হ'য়ে ওঠে। প্রদেশগুলি থেকে যে রিপোর্ট পাঠানো হয় তার উপর নির্ভর ক'রেই এই হিসাব তৈরী হয়। প্রথমে গ্রামের মোড়ল তথ্য সংগ্রহ ক'রে জিলার সদরে পাঠায়, জিলা থেকে সে খবর যায় প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছে; প্রদেশ থেকে সে খবর গিয়ে পৌঁছে কেন্দ্রে। এইভাবে ছয় লক্ষ ছাপান্ন হাজার গ্রাম থেকে তথ্য সংগৃহীত হ'য়ে হিসাব তৈরী হয়। গ্রামের মোড়ল হ'ল এই বিরাট অনুমান-সৌধের ভিত্তি; সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যখন পিরামিডের শিখরে গিয়ে আমরা পৌঁছি হিসাবটা নিতান্তই আন্দাজের ব্যাপারে গিয়ে ঠেকে। কাজেই, এটা বলাই বোধ হয় সঙ্গত যে সরকারের সংখ্যাতথ্যগুলি যথাযথ হিসাবের (Estimate) চাইতে আন্দাজের (Guestimate) উপরই নির্ভরশীল বেশি। তাদের থেকে বড়ো জোর মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু যথার্থ তথ্য কদাচ নয়। সে যাই হোক, হাতে আমাদের যেটুকু তথ্য আছে তাই দিয়ে আমাদের কাজ চালাতে হবে। সুতরাং সরকারী হিসাব মতে আমরা বিভিন্ন খাদ্যবস্তু কী পরিমাণ উৎপাদন করি সেটা দেখা যাক্।

প্রথমত আমাদের প্রধান আহার্য খাদ্যশস্যের হিসাবটা অনুধাবন করা যাক্। সর্বশেষ হিসাব অনুসারে দেখা যায়, বৎসরে প্রায় দুই কোটি নব্বই লক্ষ টন চাউল, এক কোটি টন গম, পঁচিশ লক্ষ টন যব, এক কোটি পঁচানব্বই লক্ষ টন যোয়ার—সবশুদ্ধ এই ছয় কোটি দশ লক্ষ টন

খাদ্যশস্য আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। সবটাই যে আমাদের হস্তগত হয় তা নয়, কারণ বীজরূপে ব্যবহার করবার জন্যে এবং অপচয়ের দরুণ কিছুটা পরিমাণ (প্রায় শতকরা সাড়ে বারো ভাগ) খাদ্যশস্য আমাদের আলাদা ক'রে রাখতেই হয়। সেটা বাদ দিয়ে আমাদের হাতে থাকে প্রায় পাঁচ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ টনের কাছাকাছি। এই তো গেলো উৎপন্ন শস্যের হিসাব ; এবারে আমাদের চাহিদার দিকটা একবার দেখা যাক্। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক গড়ে প্রায় দশ ছটাক শস্য দরকার একথা আমরা পাঁচের অধ্যায়ে বলেছি। নারী ও শিশুর প্রয়োজন এর চাইতে খানিকটা অল্প। সমগ্র জনসংখ্যাকে কেবল-মাত্র পূর্ণবয়স্ক পুরুষের সংখ্যায় রূপান্তরিত করতে হলে কাজ চালাবার মতো আশু উপায় হ'লো পূর্ণ লোকসংখ্যার চারভাগের তিনভাগ সংখ্যাকে পূর্ণবয়স্ক পুরুষের সংখ্যা ব'লে মেনে নেওয়া। এই ভিত্তিতে আমাদের সকলেরই মাথাপিছু রোজ ($১০ \times \frac{৩}{৪} =$) সাড়ে সাত ছটাক শস্য দরকার। সমগ্র লোকসংখ্যার জন্যে তা হ'লে দরকার ছয় কোটি এগারো লক্ষ টন। এ থেকে দেখা যায় বৎসরে আমাদের সাতাত্তর লক্ষ টন শস্য ঘাটতি পড়ছে। এই প্রসঙ্গে এটা মনে রাখা দরকার, সর্বগুণাধার পথ্যের জন্যে শাকসব্জী, দুধ ও অন্যান্য যে সমস্ত খাদ্যবস্তু অত্যাবশ্যক আমাদের দেশের লোক সেসব পাচ্ছে এই ধরে নিয়েই আমরা উপরোক্ত হিসাব করেছি। বর্তমানে কিন্তু বেশির ভাগ ভারতবাসীই শুধুমাত্র খাদ্যশস্যের উপর টিকে আছে, অন্যবিধ খাদ্যবস্তু সামান্যই তারা পাচ্ছে। এই অবস্থায় একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দশ ছটাকেরও বেশি খাদ্য দরকার। তার অর্থ, আজকের দিনে আমাদের বাস্তবিক ঘাটতির পরিমাণ উপরের হিসাবের চাইতেও অনেক বেশি। কাজেই, দেশের বর্তমান অবস্থায় বৎসরে আমাদের প্রায় এক

কোটি থেকে দুই কোটি টনের মতো ঘাটতি পড়ছে একথা যাঁরা বলেন তাঁরা নেহাৎ মিথ্যা বলেন না।

দালের হিসাবেও সুস্পষ্ট ঘাটতি চোখে পড়ে। আমাদের মোট উৎপন্ন দালের পরিমাণ হ'লো পঁচাশি লক্ষ টন। বীজ ও অপচয়ের বাবদ কিছু পরিমাণ বাদ দিলে আর থাকে পঁচাত্তর লক্ষ টন। পাঁচের অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক দেড় ছটাক দাল দরকার কাজেই আমাদের সবশুদ্ধ তিরানব্বই লক্ষ টন দাল দরকার। স্পষ্টতই, আঠারো লক্ষ টন দাল ঘাটতি পড়ছে দেখা যাচ্ছে।

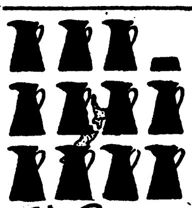
খাদ্যশস্যই যে আমাদের একমাত্র আহার্য বস্তু তা নয়, অন্যান্য খাদ্য-বস্তুর চাষও এদেশে হয়। যেমন, শাকসব্জী ও ফল—স্বাস্থ্যের পক্ষে এদের প্রয়োজন যে খুব বেশি সেকথা আগেই বলেছি। এইজন্য শাকসব্জী, ফল প্রভৃতিকে বলা হয় protective বা দেহরক্ষাকারী খাদ্য। নিরামিষভোজীদের রোজ দেড়পোয় মতো শাকসব্জী খাওয়া দরকার; আর যাঁরা আমিষ আহার করেন তাঁদের একপোই যথেষ্ট। এর থেকে দেখা যাচ্ছে মাথাপিছু প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক গড়পরতা সোয়া একপো সব্জী লাগে—বৎসরের হিসাবে মোট পরিমাণ তা হ'লে দাঁড়ালো তিন কোটি টন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে উৎপন্ন সব্জী ও ফলাদির পরিমাণ হ'লো বৎসরে মাত্র নব্বই লক্ষ টন। সুতরাং চাষ তিন গুণের বেশি বাড়ালে তবে যদি এইদিককার ঘাটতি পূরণ হয়।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য খাদ্য হ'লো দুধ। শিশুদের পক্ষে দুধ সব চাইতে প্রয়োজনীয়—আর, বলতে গেলে, আমাদের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই শিশু বা বালকবালিকা স্থানীয়। এদেশে যা দুধ উৎপন্ন

হয় তার মোট পরিমাণ হ'লো বাষট্টি কোটি মণ। তার অর্ধেক মোষের দুধ, শতকরা সাতচল্লিশ ভাগ গোরুর দুধ আর বাকী শতকরা তিন ভাগ (গান্ধীজির নিত্যনৈমিত্তিক পানীয়টুকুও এর অন্তর্ভুক্ত!) ছাগলের দুধ। এর সবটাই যে আমরা পাই তা নয়—এক্ষেত্রেও সেই একই বাধা। দুধের উপর বাছুরদের দাবী সবার আগে—গোমহিষপালন-বিশেষজ্ঞরা বলেন, আমাদের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী এইসব বাছুরদের জন্তে অন্ততপক্ষে শতকরা পনের ভাগ দুধের মায়া আমাদের ছাড়তেই হয়। তা হ'লে মানুষের খাবার জন্তে বাকী রইলো ন্যূনাধিক বায়ান্ন কোটি মণ। সকলে যদি সমানভাবে এই দুধ খাই তা হ'লে রোজ মাথাপিছু আমাদের প্রত্যেকের ভাগে পড়ে আড়াই ছটাকের মতো। কিন্তু সত্যিই যে আমরা গড়্‌পরতা অই পরিমাণ দুধ প্রত্যেকে খাই তা নয়। শতকরা সাতাশ ভাগ অর্থাৎ মোট পরিমাণ দুধের একচতুর্থাংশের কিছু বেশি মাত্র অই আকারে খাওয়া হয়, বাকী সবটুকু দুধ ঘি, মাখন, ক্ষীর, দই প্রভৃতি তৈরীর কাজে লেগে যায়।

এখন দেখা যাক্, আমাদের প্রয়োজনের অনুপাতে অই দুধ বেশি না কম। ১৯৪৩ সনে আমেরিকায় খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক যে সম্মিলিত জাতিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাদের প্রস্তাবিত আদর্শ পথ্যের তালিকায় দেখা যায় মাথাপিছু রোজ আড়াই পো দুধ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই পরিমাণকে খুব বেশি ব'লে মনে হচ্ছে, না? কিন্তু এই বিষয়ে অপর কয়েকটি দেশের হিসাব যদি আমরা গ্রহণ করি তা হ'লে আর একে অত্যধিক ব'লে মনে হবে না।

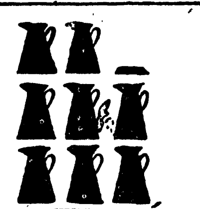


















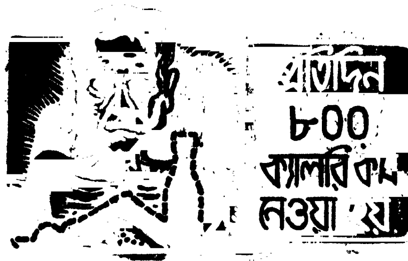
প্রত্যেকটা জাগ=৫আউন্স দুধ দৈনিক মাথা পিছু

ডিম, মাছ ও মাংস—অবশ্য, যাঁরা এ সব খান তাঁদের পক্ষে—খুব পুষ্টিকারক খাদ্য। এখানেও সেই একই শোচনীয় কাহিনী—প্রয়োজনের অনুপাতে সরবরাহের পরিমাণ অনেক কম। মাছের ব্যাপারেই অবস্থাটা সবচাইতে শোচনীয় ভাবে চোখে পড়ে। আমাদের দেশের তিনদিককার গভীর ও সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রে অপর্যাপ্ত মাছ ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের কতটুকুই বা আমাদের মুঠোয় আসে?

উপরোক্ত খুঁটিনাটি বৃত্তান্তগুলি এক সঙ্গে মিলিয়ে আমরা নিচে যে তালিকাটি পাচ্ছি তাতে আমাদের প্রধান প্রধান খাদ্যবস্তুগুলির মোট সরবরাহের একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়ঃ

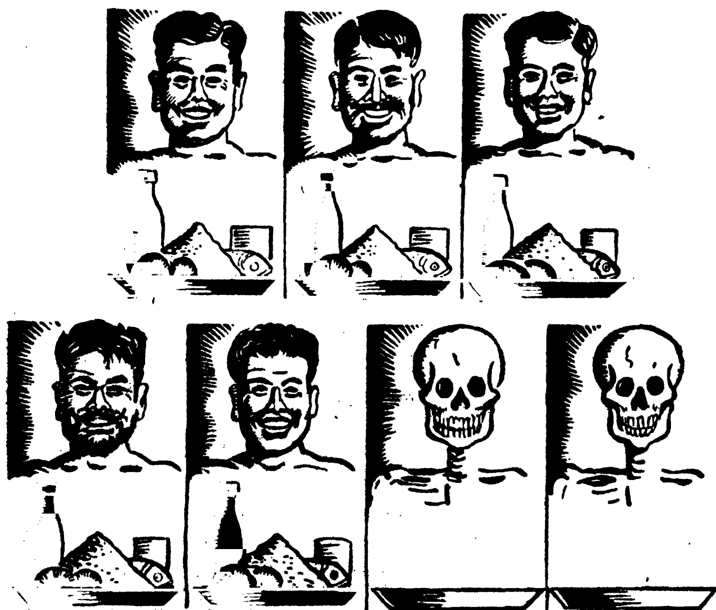
খাদ্যশস্য	...	...	৫ কোটি ৩৫ লক্ষ		টন
দাল	...	...	... ৭৫	,,	,,
ফল	...	...	১ কোটি ৭	,,	,,
শাকসব্জী	...	...	... ৯০	,,	,,
চীনাবাদাম	...	...	... ২০	,,	,,
চিনি	...	...	... ৫০	,,	,,
দুধ	...	...	১ কোটি ৮৮	,,	,,
মাংস	...	...	... ১০	,,	,,
মাছ	...	...	... ৬	,, ৭০ হাঃ	,,
ডিম	...	...	৩৩০ কোটি সংখ্যক		

এখন দেখতে হবে আমাদের জাতীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তুলনায় এই বিরাট পরিমাণ খাদ্যসম্ভার যথেষ্ট কিম্বা অপ্রতুল। আরেক-বার আমাদের পুরণো বন্ধু 'ক্যালরির' শরণাপন্ন হওয়া যাক্। যে কথা আমরা আগে বলেছি, যে কোন প্রকার খাদ্য—তার পরিমাণ বেশিই হোক্ আর কমই হোক্—ক্যালরিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এই ভাবে আমাদের সমগ্র খাদ্যের পরিমাণকে ক্যাল-রিতে রূপান্তরিত করলে তার মোট সংখ্যা হয় বৎসরে ২৯ লক্ষ কোটি ক্যালরি। এই হিসাবে আমাদের দৈনিক



মাথাপিছু দু'হাজার ক্যালরি-সংখ্যক খাদ্য দরকার। কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে হ'লে আমাদের প্রত্যেকের অন্তত পক্ষে দৈনিক ২,৮০০ সংখ্যক ক্যালরির দরকার। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে আমরা সকলেই যদি সমান পরিমাণ খাদ্য খাই তা হ'লে আমাদের প্রত্যেকের ভাগে ৮০০ ক্যালরি ক'রে কম পড়ছে, অর্থাৎ আমরা মোটে আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৫/৭ ভাগ খেয়েই জীবনধারণ করতে বাধ্য হচ্ছি।

ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে সমস্ত ভারতবাসীকে সর্বগুণাধার পথ্যের ব্যবস্থা দেওয়া হোক্ এই যদি আজ সিদ্ধান্ত হয় তা হ'লে অন্তত পক্ষে এদেশের এগারো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোককে না খেয়ে থাক্‌তে হয়।



৮

ফলাফল

উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য না খেতে পাওয়ার ফলে অথবা অনুচিত খাদ্য গ্রহণ করায় আমাদের দেহের উপর তার যে প্রতিক্রিয়া হয় সেটা একবার চট্‌পট্‌ দেখে নেওয়া যাক্‌। কথায় বলে 'পোষাকই লোকের আসল চেহারা।' খাদ্য বোধ হয় তারও চাইতে বেশি। আমরা যা খাই তাই দিয়ে আমরা তৈরী—অন্ততপক্ষে অনেকখানি। এটা যে শুধু আমাদের দেহের পক্ষেই সত্য তা-ই নয়; মনের পক্ষে, চরিত্রের পক্ষে মেজাজের পক্ষেও। বাংলা দেশের বিগত খাদ্যসঙ্কটই তার প্রমাণ। দেশের একটা বড়ো অংশ সেই সময় অনাহারে ছিলো—মাত্র কয়েকদিনের অনশনের ফলে সাধারণ সুস্থ মানুষের চরিত্র কিরূপ শোচনীয় ভাবে বদ্‌লে যায়, দুর্ভিক্ষ সেটা ভালো ক'রে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। যথেষ্ট আত্মসম্মান-বিশিষ্ট মানুষেরাও খাদ্যাভাবে নিজেদের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে এবং পশুর ন্যায় আচরণ করে। একটি মাত্র হাড়ের টুক্‌রোর অধিকার নিয়ে কুকুরগুলি যেমন দাঁত খিঁচোখিঁচি করে, সামান্য খাদ্য নিয়ে এই সব ভালো লোকদের তখন ঠিক তেম্নিভাবে কলহ করতে দেখা যায়। মাত্র কয়েক আনার বিনিময়ে মা অনায়াসে শিশুকে বিকিয়ে দেয়; স্বামী যায় স্ত্রীকে ছেড়ে। সোজা কথা এই যে, অনশন মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সাধারণ মানুষ প্রায়ই ভেঙে পড়ে।

তারই উল্টো পিঠে সাধারণ একটি গাঁয়ের ছেলের অবস্থাটা এবার লক্ষ্য করা যাক্‌। ক্ষেতমজুরের ছেলে—হয়ত ভালো ক'রে খেতে পরতে পায় না, হাড় জিড়্‌জিড়ে অবস্থা, পরণে ছেঁড়া, ময়লা কাপড়—যতোক্ষণ তার এই অবস্থা, মুখেচোখে কেমন একটা সদাসন্ত্রস্ত ভাব, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা বলে, তাঁদের কুটোমাত্র কাজ ক'রে

দিতে পারলেও ধন্যি হ'য়ে যায়, এমন কি জমিদারের পেয়াদাকেও সে একটা কেউ-কেটা মনে ক'রে তাকে সমীহ ক'রে চলে। সেই একই ছেলেকে সৈন্যদলে ভর্তী করে দেওয়া যাক, তাকে ভালো খেতে-পরতে দেওয়া হোক, কয়েকমাস অন্তে দেখবেন তার চেহারা আগা-গোড়া বদলে গেছে। সে আর সেই দুর্বল, ভয়কাতুরে ছেলেটি নেই, ভালো খেয়ে-প'রে সে তখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুশিক্ষিত ও সাহসী সৈন্যদলের একজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

কাজেই আসল সমস্যাটা হ'লো খাদ্যের। ভারতবাসীর জীবনে উপবাস প্রায় একটা স্থায়ী অভিশাপের মতো হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বহুদিন ধ'রে না খেতে খেতে আমরা এমনই দুর্বল হয়ে পড়েছি যে বলিষ্ঠ স্বাধীনতার আদর্শের বোধ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে স্তিমিত; স্বাধীন জাতিত্বের অধিকারের কথা আমরা যেন তেমন জোর গলায় প্রচার করতে পারছি না। আমাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ যেমন একটি মস্ত বাধা, ঠিক তেম্নি এই পুষ্টিহীনতার অভিশাপও আমাদের নানাভাবে দাবিয়ে রাখছে। আমরা যে নিজেদের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারছি না এবং পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘের দরবারে সমক্ষমতাবিশিষ্ট স্বাধীন ভারতের আসন কায়েম করতে পারছি না আমাদের জাতিগত পুষ্টিহীনতাই বোধ হয় তার আসল কারণ।

অকর্মণ্যতা ও ঢিলেমি এই একই পুষ্টিহীনতার ফল। আমাদের কারখানার মজুর ও ক্ষেতের চাষীরা অলস ও অপটু এইরূপ অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। এই ধরণের অভিযোগ অনেকখানি সত্য। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ একজন খনিমজুর যেখানে বৎসরে গড়ে ৫৮৯ টন কয়লা তোলে, ইংলণ্ডের মজুর সেখানে তোলে ৩০০ টন, জার্মাণীর ২৪৩ টন, আর ভারতীয় মজুর সেখানে তোলে মাত্র ৮০ টন।

অন্যান্য আরো অনেক দেশের নজীর দেখিয়ে এই বৈষম্য প্রতিপন্ন করা



যেতে পারে। পুষ্টিকারক খাদ্যের অভাব যে অন্তত অংশত এই অবস্থার জন্যে দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যারা অসুস্থ ও দুর্বল তাদের পক্ষে স্বাধীনতা ও কর্মক্ষমতা অর্জন করা সহজ নয়। সেইজন্যেই প্রাচীন রোমকেরা বল্‌তো—*Mens sana in corpore sano*—কিনা, সুস্থ দেহে সুস্থ মন। কিন্তু সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের জন্যে সর্বাগ্রে দরকার পুষ্টিকারক খাদ্য। আমাদের দেশের অধিবাসীদের সাধারণ খাদ্যে পুষ্টির ভাগ যে কতো কম সে কথা আমরা আগেই বলেছি। এতে ক'রে তারা সহজেই নানা ব্যাধি ও রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। অবশ্য, এর থেকে এটা বোঝায় না যে কেবলমাত্র পুষ্টিহীনতাই অস্বাস্থ্যের জন্যে দায়ী। আমাদের ক্ষীণ জীবনীশক্তি ও রোগের প্রবল প্রকোপের অন্যবিধ কারণও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অপরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের অপব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের জনস্বাস্থ্য আশানুরূপ নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন একটি সুপরিচালিত কার্যকরী বিভাগেরও অভাব। তারপর আছে শিশুবিবাহ, পর্দাপ্রথা প্রভৃতির মতন কতকগুলি সামাজিক কুসংস্কার। ম্যালেরিয়া আরেকটি বড়ো অভিশাপ। কিন্তু এ সব বাদ দিয়েও বলা যায়—এবং

সে বলাটা বোধ হয় অসঙ্গত নয়—যে ত্রুটিযুক্ত আহারই ভারতবাসীর দুর্গতির জন্যে প্রধানত দায়ী।

খাদ্যপ্রাণ ও ধাতব লবণ প্রভৃতি খাদ্যোপকরণগুলি শরীর রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন এবং তাদের অভাবে দেহে নানা রোগের সৃষ্টি হয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ কথা আমরা বলেছি।

অনুপযুক্ত, অপ্রতুল খাদ্য আমাদের জাতির স্বাস্থ্যের পক্ষে কীরূপ মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হৃদয়ঙ্গম করার বোধ হয় সব চাইতে সোজা পথ হ'ল চিত্রগুপ্তের খতিয়ানের হিসাব নেওয়া। এই দিক দিয়ে ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট দেশগুলির অন্যতম। আমাদের দেশে প্রতি হাজারে ২২·৪ জন ক'রে লোক মারা যায়। এসিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থা কিন্তু এতটা খারাপ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যবদ্বীপের মৃত্যুর হার হ'লো হাজার করা ১৮·৮ আর জাপানের ১৭। এই ব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশগুলির অবস্থা আমাদের চাইতে অনেক ভাল। গ্রেট ব্রিটেনের মৃত্যুর হার হ'লো হাজারকরা ১২·৪ আর যুক্তরাষ্ট্রের ১১·২—ঠিক আমাদের অর্ধেক।

শিশু মৃত্যুহারের বেলায়ও ঠিক একই শোচনীয় ব্যাপার চোখে পড়ে। যেসব শিশু জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে কিন্তু এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই মারা যায় শিশুমৃত্যুর খতিয়ানের মধ্যে শুধু সেইসব শিশুর হিসাবই গ্রহণ করা হয়। ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক যতো শিশু মারা যায় তার সংখ্যা দশলক্ষেরও বেশি। অর্থাৎ জন্ম লাভ করার পর প্রতি হাজারটি শিশুর মধ্যে ১৬২টি শিশুই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই তো গেলো এদেশের হিসাব ; জাপানের শিশু-মৃত্যুহার হ'লো হাজারকরা ১০৫, গ্রেট ব্রিটেনের ৫৮ আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৫৪। হিসেব ক'রে দেখা গেছে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর সব-শুদ্ধ যতো লোক মারা যায় তার অর্ধেকই দশবৎসরের অনধিকবয়স্ক শিশু।

তারপর, শিশুজন্মের সময় যতো স্ত্রীলোক এদেশে মারা যায় তার সংখ্যা পৃথিবীর যেকোনো দেশের প্রসূতি-মৃত্যুর হারের চাইতে বেশি। এদেশে প্রতি হাজারটি প্রসূতির মধ্যে প্রায় চব্বিশটি প্রসূতি প্রসবকালে মারা যায়। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, প্রতিবৎসর অন্যূন দুই লক্ষ স্ত্রীলোকের এইভাবে শোচনীয় জীবনান্ত হয়।

এই সবকিছুর যোগাযোগে ফল দাঁড়িয়েছে এই যে এদেশে যখন কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করে গড়পরতা বড়োজোর ২৭ বৎসর মাত্র বাঁচবার আশা তার থাকে। জাপানের জাতকের প্রত্যাশিত পরমায়ু হ'লো ৪৭ বৎসর, ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র এই দুইয়ের হ'লো ৬২ বৎসর আর নিউজীল্যাণ্ডের সব চাইতে বেশি—৬৭ বৎসর।



৯

খাদ্যখাদক সমস্যা

দেশে যদি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য থাকে, তাহ'লে প্রত্যেকের ভাগে কতোটা পড়বে তা নির্ভর করবে খাদকের সংখ্যার উপর। ভাষান্তর ক'রে বলা যায়, খাদ্যসম্পর্কিত যে কোন আলোচনায় দেশের লোকসংখ্যার সমস্যা একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

গত কয়েক শতাব্দীর ভেতরে ভারতের লোকসংখ্যা অভাবিতরকম বেড়ে গেছে! সতেরো শতকের গোড়ার দিকে, অর্থাৎ আকবর যে বৎসর (১৬০৫ সাল) মারা যান তারই সমসাময়িক কিম্বা কাছাকাছি সময়ে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র দশ কোটি এইরূপ অনুমান করা হয়। অবশ্য এই অনুমান কতদূর সত্য তা সঠিক বলা মুস্কিল। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় পনেরো কোটির কোঠায়। ১৮৭২ সালে লোকসংখ্যা ছিল বিশ কোটি ষাটলক্ষ; ১৯৩১ সালের আদমসুমারী মতে সেই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশ কোটিতে আর আটত্রিশ কোটি নব্বই লক্ষ হ'লো ১৯৪১ সালের গণনার হিসাব। প্রতি বৎসর পঞ্চাশ লক্ষ ক'রে লোক সংখ্যা বেড়েছে এই যদি ধরে নিই তা হলে আজকের লোকসংখ্যা হয় চল্লিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। ভারতের লোকসংখ্যা ক্রমাগত এবং অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা ভাবলে অন্যায় হবে পৃথিবীর সমস্ত লোকের মধ্যে আমরাই শুধু লোকবল বৃদ্ধি করে চলেছি। বস্তুত, গত পঞ্চাশ বৎসরের হিসাব যদি নেওয়া যায় তা হ'লে দেখা যাবে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের লোকবৃদ্ধির হার বরং অপেক্ষাকৃত অনেক কম। ১৮৭০—১৯৩০ সালের মধ্যে আমাদের

লোকসংখ্যা মাত্র শতকরা ৩০·৭ হারে বেড়েছে, কিন্তু ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের বেড়েছে শতকরা ৭৭ হারে, জাপানের ১১৩ ও রাশিয়ার ১১৫ হারে। কিন্তু সেইসব উদ্বৃত্ত লোকসংখ্যাকে খাওয়াবার সামর্থ্য রাশিয়া ইংলণ্ড জাপান প্রভৃতির হয়েছে এইজন্যে যে তাদের কারও হয়তো উপনিবেশ আছে, কারও আছে শোষণ করবার মতো প্রভাবাধীন অঞ্চল। তাছাড়া, তাদের সবক'টিই শিল্পোন্নত দেশ, আর্থিক দিক থেকে খুব সমৃদ্ধ—এই উভয়বিধ কারণে জনবৃদ্ধির সমস্যা তাদের বিচলিত করতে পারে নি। এই ব্যাপারে আমাদের অবস্থা কিন্তু একেবারে ভিন্ন, আমরা তাই সেসব দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারি না। আমাদের দেশে প্রতি ছয়টি নবজাত শিশুর মধ্যে একটি ক'রে শিশু মারা যায় এই শোচনীয় ঘটনা এবং স্ত্রীপুরুষ শিশু নির্বিশেষে সকলের অশেষ দুর্গতির কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় জন্মবৃদ্ধির জন্যে আমাদের বড়ো বেশি উচ্চমূল্য দিতে হচ্ছে—অই মূল্য বহন করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

বর্ধিষ্ণু জনতাকে ভারতবর্ষ মাত্র একটি উপায়েই খাওয়াতে পারে এবং সে উপায়টি হ'লো আরও খাদ্য উৎপাদন করা। তা হ'লে কি জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাদ্য উৎপাদনও সমান তালে বেড়ে চল্‌ছে না? খাদ্য এবং লোকসংখ্যা এই উভয়ের মধ্যে যে দৌড় প্রতিযোগিতা চলছে তাতে কার জিৎ হচ্ছে এ বিষয়ে কিছু মতভেদের অবকাশ আছে। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর *The Food Supply* বইতে বলেছেন যে ১৯১০—১৯১৫ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা ও উৎপন্ন খাদ্যের মান ছিল ১০০ এই যদি ধ'রে নেওয়া যায় তা হ'লে দেখা যায় ১৯৩৭-৩৮ সালে খাদ্য-সরবরাহের মান দাঁড়িয়েছে ১১৮-র কোঠায় আর জনসংখ্যার মান

উঠে গেছে ১২৫-এ। অর্থাৎ রেসে খাদ্যের হার হয়েছে। এই গেলো একদিককার কথা। অপরদিকে দেখুন কেট, এল, মিচেল তাঁর *India Without Fable* বইতে বল্‌ছেন যে "১৯১০ ও ১৯৩০ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১৭ হারে কিন্তু খাদ্যউৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৩০ হারে।" পি, জে, টমাস ও এন, এস, শাস্ত্রী তাঁদের *Indian Agricultural Statistics* বইতে হিসেব করে দেখিয়েছেন যে ১৯২০—২২ সালে জনসংখ্যা ও কৃষিজাত দ্রব্যের মান ১০০ ছিল এই যদি ধরে নেওয়া যায় তাহ'লে ১৯৩৪-৩৬ সালের মধ্যে জনসংখ্যার মান দাঁড়িয়েছে ১১৫ আর কৃষিজাত দ্রব্যের মান গিয়ে পৌঁচেছে ১২১-এর কোঠায়। সবগুলি হিসাবই কেমন ধোঁয়াটে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ভারতের খাদ্য উৎপাদনের হিসাব মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়; তাদের সাহায্যে আপনার যা ইচ্ছা তাই আপনি প্রমাণ করতে পারেন!

ব্রিটিশ ভারতের প্রত্যেকটি লোকের ভাগে গড়ে ০·৮৬ একর পরিমাণ জমি পড়ে, হিসাবে এইরূপ অনুমিত হয়। সমগ্র দেশের হিসাবও যদি নেওয়া যায় তা হলেও উপরোক্ত সংখ্যার খুব বেশি এদিক-ওদিক হবে বলে মনে হয় না। আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা মনে করেন উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের জন্যে মাথাপিছু ৩·১ একর জমি দরকার; আর যাকে বলা হয় "জরুরী অবস্থার নিয়ন্ত্রিত খাদ্য" তার জন্যেও অন্ততপক্ষে ১·২ একর পরিমাণ জমি আবশ্যক। উপরোক্ত সংখ্যাগুলির আলোকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে তুলনায় আমাদের অবস্থা বড়ো শোচনীয়। আমাদের দেশে $\frac{\text{আবাদী জমি}}{\text{জনসংখ্যা}}$-র হার খুবই নিচের দিকে প'ড়ে রয়েছে। এই হার বাড়ছে না কম্‌ছে? যদিও

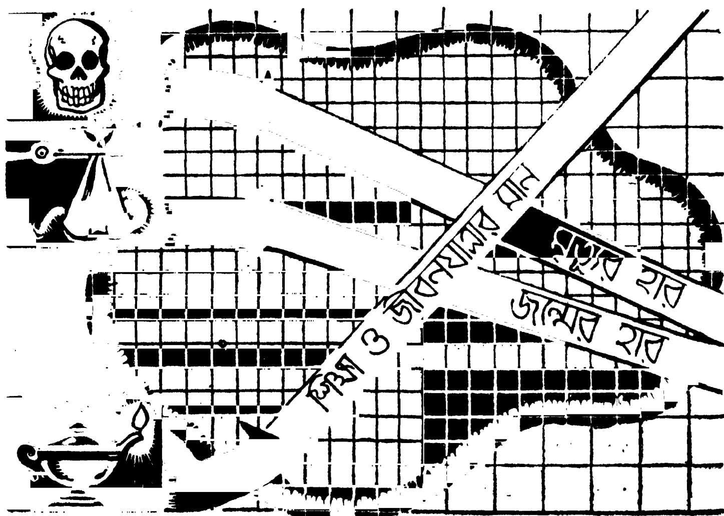
এই বিষয়ে নজীরপ্রমাণ সবই গোলমেলে ও পরস্পরবিরোধী তা হ'লেও ডাঃ ডব্ল্যু, আর, এক্রয়েড তাঁর *Nutrition* পুস্তিকায় যে কথা বলেছেন তা অনুমোদন করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। তিনি বলেন: "যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে তা থেকে এই মনে হয় যে আবাদী জমির পরিমাণ জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে না বেড়ে বরং কম্‌ছে।"

এই অবস্থার যে পরিবর্তন হতে পারে না তা নয়। কেননা, এ দেশের আবাদযোগ্য অনেক জমি এখনও অনাবাদী পড়ে আছে; তা ছাড়া যে সব জমি সচরাচর আবাদ হচ্ছে তাদের উৎপাদনক্ষমতা ইচ্ছে করলে এখনও অনেক বাড়ানো চলে। অতিরিক্ত লোকসংখ্যার জন্যেই যে ভারতীয়রা উপবাসী থাকতে বাধ্য হচ্ছে এটা মনে করবারও কারণ নেই। এর অর্থ শুধু এই যে আমাদের খাদ্যউৎপাদনের হার আমাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে আরও বাড়া দরকার। কেট্ মিচেল ঠিকই বলেছেন:

> "এ কথা সত্য যে বর্তমান উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ মোটেই পর্যাপ্ত নয়; কিন্তু এই অপ্রতুলতার জন্য অতিরিক্ত লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিকে দায়িক করা চলে না, উৎপাদন পদ্ধতির ত্রুটি এবং চাষের জমি বাড়ানোর অক্ষমতাই এর কারণ। বস্তুত, এটা বিশ্বাস করার পক্ষে বহু যুক্তি রয়েছে যে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষ বর্তমান লোকসংখ্যার চাইতে অনেক বেশি লোককে ভরণপোষণ করতে পারে। লোকবৃদ্ধির হার ভারতের দারিদ্র্যের কারণ নয়, কারণ হ'লো এই যে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রক্রিয়া রুদ্ধ হ'য়ে আছে।"

কেট্ মিচেলের কথা যদিও নিঃসন্দেহে সত্য, তা হলেও

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা অত্যধিক একথা মান্‌তেই হয়। অধ্যাপক কার-সণ্ডার্সের ভাষায় বলা যায়, "সমস্ত অবস্থা দৃষ্টে ভারতের জনসংখ্যা বড়ো বেশি।" যতোদিন না কৃষিব্যবস্থাকে উন্নত পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে পারছি এবং কার-সণ্ডার্স কথিত "অবস্থাগুলির" পরিবর্তন সাধন করতে পারছি ততোদিন পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া দ্বারা লোকসংখ্যাবৃদ্ধিকে রোধ করাটাই বোধ হয় আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর। দুর্ভাগ্যবশত, এই দুই করণীয়ের মধ্যে প্রথম প্রক্রিয়াটি এদেশের লোকদের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যহেতু অনেক বেশি দুঃসাধ্য। কাজেই জন্মনিয়ন্ত্রণের সুবিধাদান আমাদের জনস্বাস্থ্য-বিভাগীয় কর্তব্য রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত, তবে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হ'লো উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ ততোদূর বাড়ানো যাতে সমগ্র জনসংখ্যার



অন্নসংস্থান সম্ভব হয়। সেটা কতো দূর ? সপ্তম অধ্যায়ে আভাসে এর জবাব আমরা দিয়েছি। সেখানে বলা হয়েছে যে জাতি হিসাবে আমাদের যতোটা পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন তার মাত্র ⅘ ভাগ খাদ্য আমরা বর্তমানে দেশে উৎপাদন করছি। সব জড়িয়ে শতকরা ৩০ ভাগ হারে যদি উৎপাদন বাড়ানো যায় তা হ'লে বর্তমান লোকসংখ্যার উপযোগী খাদ্যসংস্থান হ'তে পারে। লোকসংখ্যা যদি আরও বাড়ে তা হ'লে খাদ্যোৎপাদনকেও সেই অনুপাতে বাড়াতে হবে। সে কি অসম্ভব ? হয়ত বা দুরূহ, কিন্তু অসম্ভব নয়। পরের অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, জীবনযাত্রার মান আর শিক্ষার হার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্মহার ক'মে আসে। বোধ হয় লোকের মধ্যে ক্রমশ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন হওয়ার ফলেই এইরূপ হয়। এটা বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হ'লে ভারতবর্ষেও এই প্রক্রিয়া ক্রমে চালু হবে। এই যে "পঞ্চদশ-বার্ষিকী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা" করা হয়েছে তা যখন কার্যকরী হবে তখন স্বভাবতই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন হবে। শিক্ষিত ও সম্পন্ন লোকদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচার করা অনেক সহজ। কাজেই, জন্ম আর মৃত্যু এই উভয়বিধ ঘটনার নিয়ন্ত্রণের ফলে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার হ্রস্বতর করা তখন অনেক সুসাধ্য হবে। এইচ, জি, ওয়েল্‌স্‌ যাকে বলেছেন "জন্ম ঝটিকা" সেই ঝটিকা শান্ত করা তখন আর অসম্ভব হবে না—আমরা সংখ্যাবহুলতা কমিয়ে গুণের দিকে মন দিতে পারবো।

১০

আরও খাদ্য চাই

চিরন্তন খাদ্যাল্পতা দূর করার সমস্যা বাদ দিলেও আরও একটি সমস্যার আশু সমাধান দরকার। সেটি হচ্ছে যুদ্ধজনিত প্রবল খাদ্যাভাবের সমস্যা। এই সমস্যা মেটাবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র অনেক জায়গায় আরও খাদ্য উৎপাদনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে বিষয়ে চেষ্টাও চল্‌ছে। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ড তার প্রয়োজনীয় খাদ্যের শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র নিজে জন্মাতো। উৎপাদন অভিযানের ফলে ১৯৪২ সালে ইংলণ্ড শতকরা ৬০ ভাগ স্বয়ংনির্ভরশীল হয়ে ওঠে এবং ১৯৪৩ সালে তা বেড়ে গিয়ে হয় শতকরা ৭৫ ভাগ। এটা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। ভারতবর্ষেও কর্তারা "আরও খাদ্য বাড়াও" নামক অভিযান সুরু করেন। এযাবৎ ৫০ লক্ষ একর পরিমাণ জমি—যাতে আগে তুলোর চাষ হ'তো—খাদ্যচাষের জমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং যা এতোদিন অনুর্বর অবস্থায় অনাবাদী প'ড়ে ছিল সেইরূপ আরও ৩০ লক্ষ একর জমিকে খাদ্যচাষের আওতায় আনা হয়েছে, সরকারের তরফ থেকে এইরূপ দাবী করা হয়েছে। কিন্তু আবাদী জমির পরিমাণ বাড়া সত্ত্বেও চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের উৎপাদন যুদ্ধকালে খুব বেশি বেড়েছে ব'লে মনে হয় না। ইংলণ্ডে এই ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে তার সঙ্গে তুলনায় এদেশের অগ্রগতি কতোই না সামান্য! এই বৈষম্যের অনেকগুলি কারণ আছে। একটি কারণ এই যে অনেক জমি—শতকরা ৪০ ভাগেরও উপরে—আগে থেকেই চাষ হ'য়ে আসছিল এবং তাদের পরিমাণ বাড়ানো আর সম্ভব

ছিলো না। আরেকটি কারণ এই যে এদেশের লোক ইংলণ্ডের লোকের মতো 'অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন' অভিযানের আহ্বানে তেমন উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দেয় নি। ইংলণ্ডে রাষ্ট্রের সঙ্গে জনসাধারণের যে সম্বন্ধ এদেশের সরকারের সঙ্গে দেশবাসীদের সেই সম্বন্ধ নয়, তারই জন্যে দুই জায়গায় দুই ফল দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া, এখানকার সরকারের সেই পরিচালন ক্ষমতা ও কর্মপ্রচেষ্টারও অভাব—ইংলণ্ডের সরকার যে ভাবে খাদ্য উৎপাদনকারীদের মুক্তহস্তে সাহায্য করেছেন ভারতবর্ষীয় কর্তারা তেমন ভাবে এদেশের উৎপাদনকারীদের সাহায্য করতে অগ্রসর হন নি।

যথার্থ সুযোগ সুবিধা পেলে ভারতবর্ষের খাদ্যোৎপাদনকেও কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ কিম্বা ত্রিগুণ করা যেতে পারে। "পঞ্চদশ-বার্ষিকী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা"-য় খাদ্য সম্বন্ধে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার সাহায্যে বর্তমান উৎপাদনের উপর আরো শতকরা ১৩০ ভাগ খাদ্যবৃদ্ধি সম্ভব হবে। ভারতবর্ষে কৃষি ও পশুপালনের উন্নয়নার্থে যে রাজকীয় কৃষি অনুশীলন সমিতি আছে তার স্মারকলিপিতে দেখি দশ বৎসরে শতকরা ৫০ ভাগ, এবং তৎপরবর্তী পাঁচ বৎসরে আরও শতকরা ৫০ ভাগ খাদ্যোৎপাদন বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। তার মানে, আগামী পনেরো বৎসরে বর্তমান উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণিত করা সম্ভব। পঞ্চদশ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে এইজন্যে ১,২৪০ কোটি টাকা মোট ব্যয় ধার্য করা হয়েছে, সরকারী স্মারকলিপিতে সেখানে ধার্য হয়েছে সবশুদ্ধ ১,০০০ কোটি টাকা। তবে কথা হচ্ছে এই যে টাকা কিম্বা কাগজের নোট তো আর বীজের মতন মাটিতে পোঁতা যায় না, তার থেকে খাদ্য উৎপাদনও সম্ভব নয়; তাই আমাদের দেখ্তে হবে এই মোটা অঙ্কের টাকাকে প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষিউন্নয়নের কাজে কী হ'লে সব চাইতে সুন্দর ভাবে নিয়োগ করা যায়।

দুই ভাবে এই কাজ আরম্ভ করা যায়। এক হচ্ছে, আবাদী জমির পরিমাণ যতোদূর সম্ভব বাড়ানো, দ্বিতীয় পথ হ'লো, যে জমি আছে তাতেই আরও বেশি উৎপাদন করা। প্রথমটিতে দরকার ব্যাপক চাষ, দ্বিতীয়টিতে সযত্ন চাষ।

সবশুদ্ধ ভারতবর্ষের জমির পরিমাণ হ'লো একশো কোটি একর। এর ভেতর প্রায় ৩৬ কোটি একর পরিমাণ জমিতে বর্তমানে চাষ হ'য়ে থাকে; পতিত জমির পরিমাণ প্রায় ৮ কোটি একর; ১৭ কোটি একর পরিমাণ জমি আবাদযোগ্য কিন্তু অনাবাদী প'ড়ে আছে। বাকী যেসব জমি আছে তারা একেবারেই চাষের আযোগ্য। কাজেই দেখা যাচ্ছে, উপরের হিসাব অনুসারে প্রায় ২৫ কোটি একর জমি এখনও ইচ্ছে করলে চাষের আওতায় আনা যায়। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা দরকার, আবাদ করতে পারাটাই সব নয়, ব্যয়ের প্রশ্নটাই হ'লো আসল। এমন জমিই বেশি যাদের চাষ করতে যাওয়া মানে খরচান্ত হওয়া—জমির যা দাম খরচ তাকে যাবে ছাড়িয়ে। এর কতকাংশ ঘাসজঙ্গলে ভর্তি কতকাংশ জলময় তাই চাষের অনুপযুক্ত, আর কতকাংশ হয় বালিমাটিতে ভরা, নয় তো লবণাক্ত কিম্বা ক্ষারযুক্ত। এই আবাদ-যোগ্য অকেজো জমিগুলি জরিপ করলে হয়ত দেখা যাবে এর অনেকটা অংশেই লাঙল দেওয়া যেতে পারে। তবে যারা জমি চাষ করবে সেইসব চাষীরা যাতে সরকার থেকে সব বিষয়ে আনুকূল্য পায় সেটা দেখ্‌তে হবে। জল, চাষের বলদ, বীজ ও অন্যান্য চাষের যন্ত্রপাতির সুবিধা দিলে তবে যদি তারা এই কাজ মন দিয়ে করে।

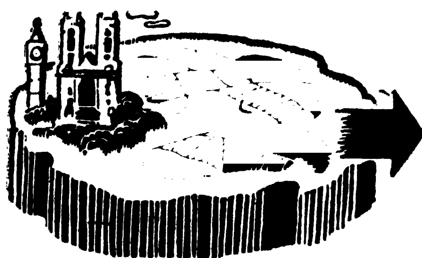
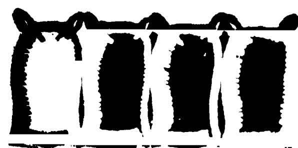
চাষের জমির আয়তন বাড়িয়ে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানো যায় সত্য, কিন্তু ঘাটতি পূরণের তার চাইতেও সহজ পথ হচ্ছে আবাদী জমি-গুলিতে আরও বেশি শস্য উৎপাদনের চেষ্টা করা। এই দিক

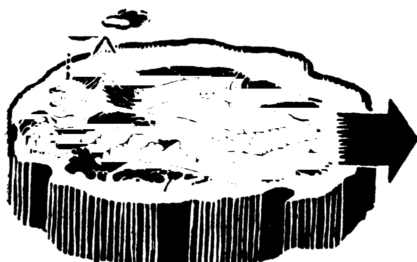
দিয়ে অনেকখানি উন্নতি সম্ভব। অন্যান্য দেশের উৎপাদনের সঙ্গে আমাদের দেশের উৎপাদনের পরিমাণ তুলনা করলেই বোঝা যাবে আমরা এ বিষয়ে কতো পেছিয়ে আছি। এখানে চাউলের হিসাব দেওয়া হ'লো :

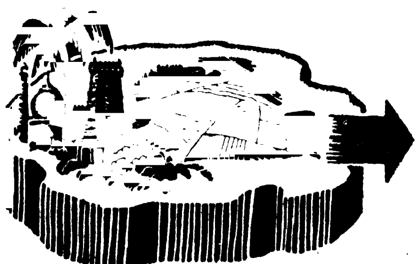
ভারতবর্ষ	...	...	প্রতি একর জমিতে ১০ মণ				
চীন	...	...	„	„	„	১৭ „	২০ সের
যুক্তরাষ্ট্র	...	...	„	„	„	১৮ „	৫ „
মিশর	...	...	„	„	„	২৫ „	... ...
জাপান	...	...	„	„	„	২৮ „	৩০ „
ইতালী	...	...	„	„	„	৩৭ „	২০ „

গমের বেলাতেও অই একই অবস্থা। বহু বৎসর যাবৎ আমাদের গমের উৎপাদনের পরিমাণ ঠায় এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে—প্রতি একরে ১০ মণ মাত্র। জার্মাণীতে কিন্তু অন্য রকম দেখি। ১৯২১ সালে উৎপন্ন গমের পরিমাণ যেখানে মাত্র ছিল একর প্রতি ১৮ মণ ৩০ সের, ১৯৪১ সালে তা বেড়ে গিয়ে হয়েছে ২৭॥০ মণ। ইতালীতেও দেখি অই দশ বৎসরের মধ্যে একর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ১২॥০ মণ থেকে ১৬ মণ ৩৫ সেরে এসে দাঁড়িয়েছে।

হিসাব করে দেখা গেছে, ইংলণ্ডের এক একর জমিতে যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় ভারতবর্ষে সেই পরিমাণ জমিতে তার এক-চতুর্থাংশ মাত্র উৎপন্ন হয়। এদিকে সমান পরিমাণ জমিতে জাপান আমাদের চাইতে তিনগুণ বেশি শস্য উৎপাদন করে। পরের পাতার ছবিটি দেখলেই তা বুঝতে পারবেন।




যে যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে কৃষির উন্নতি বিধান করা যায় তা বহুবিধ ও বিচিত্র। এই প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া কার্যকরী করতে হ'লে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও প্রচুর গবেষণা দরকার।

কৃষি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হ'লে জল-সেচের সুব্যবস্থা যতো দরকার বোধ হয় আর কোনো জিনিষই ততো দরকার

নয়। স্বাভাবিক আর কৃত্রিম—এই দুইভাবেই জলসেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জলসেচ বা পূর্তকার্যের ক্ষমতা অপরিসীম—মরুভূমিকে শস্যশ্যামল দেশে রূপান্তরিত করা তার পক্ষে কিছুই নয়। যেসব জমিতে বরাবর চাষ হচ্ছে জলসেচের ব্যবস্থা দ্বারা তার উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ করাও অসম্ভব নয়। ভারতের সমস্ত আবাদী জমিতে যদি ঠিক ভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় তা হ'লে শুধু তাতেই উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে যাবে ব'লে বিশ্বাস।

উত্তম সারের সাহায্যেও শস্যের পরিমাণ অনেকখানি বাড়ানো যেতে পারে। কার্যকরিতার দিক থেকে জলসেচের ঠিক পরেই সারের স্থান। জমিতে ভালো সার ফেলে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে তাতে শতকরা ১৫০ ভাগ পর্যন্ত শস্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এই থেকেই এর অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের সমস্ত জমিতে যদি ঠিক ঠিক ভাবে সার দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তা হলে সব জড়িয়ে শস্যোৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে এইরূপ আশা। এদেশে সার তেমন মেলে না, দুইভাবে এই সারের স্বল্পতার সমস্যার সমাধান করা যায়। এক, গোবর প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্রজাত সার ব্যবহার করা; নয় তো সহরের আবর্জনা থেকে তৈরী সার কাজে লাগানো। জমির পক্ষে এই জাতীয় সারের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। এতেও যদি সবটুকু উপকার না পাওয়া যায় তা হলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী উর্বরাশক্তিবিশিষ্ট কৃত্রিম উপাদান বিবেচনা মতো প্রয়োগ ক'রে সেই ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে। বিশেষ ক'রে এই দিক দিয়ে Sulphate of ammonia-র ব্যবহার খুব প্রশস্ত। হিসাব ক'রে জানা গেছে ভারতবর্ষে এই রাসায়নিক উপাদানটি প্রায় ৫০ লক্ষ মণ সংগ্রহ করা সম্ভব। আপাতত প্রারম্ভিক ব্যবস্থা হিসেবে যাতে বৎসরে

তা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন ক'রে তৈরী করা যায় তারই উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান চল্‌ছে। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা দরকার যে নির্বিচারে রাসায়নিক সার ব্যবহার করার বিপদও আছে, তাতে জমির ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে। গোবর প্রভৃতি জান্তব সার দিয়ে যেখানে সবটুকু ফল পাওয়া যাচ্ছে না সেখানেই শুধু পরিপূরক হিসেবে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার দ্বারাও জমির উৎপাদন শক্তি বাড়ানো সম্ভব। এইভাবে অতিরিক্ত শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ শস্য ফলানো যেতে পারে।

উন্নত ধরণের চাষের যন্ত্রপাতি, ট্র্যাক্‌টর, ফসল-মাড়ানো ও ফসল-কাটার কল প্রভৃতি কৃষি-যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা চাষের যে উন্নতি হয় তা-ও বিবেচনা করবার মতো। কিন্তু এখানেও সেই একই সাবধানতার প্রয়োজন। অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ট্র্যাকটর ব্যবহার করলে জমির ঘোরতর অনিষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে, এমন কি জমি চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। তাই যান্ত্রিক কৃষিপদ্ধতি চালু করতে গেলে খুব হুঁসিয়ারি দরকার এবং সর্বদাই তাকে আয়ত্তের ভেতর রাখা চাই।

জমির পক্ষে মারাত্মক যেসব ক্ষতির কারণ চোখে পড়ে তার ভেতর মাটি-ক্ষয়ে-যাওয়া অন্যতম। এই ক্ষতি বন্ধ করতেই হবে। আমাদের নির্বুদ্ধিতার জন্যেই এইরূপ হয়। ভগবান নিজে কখনও মরুভূমি সৃষ্টি করেন নি এই চল্‌তি কথাটা সর্বাংশে সত্য। জমির উপরিভাগ সমতল ক'রে বাঁধ বেঁধে দিতে পারলে জমির ক্ষয় নিবারণ করা যেতে পারে। ব্যাপকভাবে বনবাদাড় সৃষ্টি ক'রেও এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

আরেকটি বিষয়ে চাষীকে সাহায্য করা দরকার। অতিরিক্ত

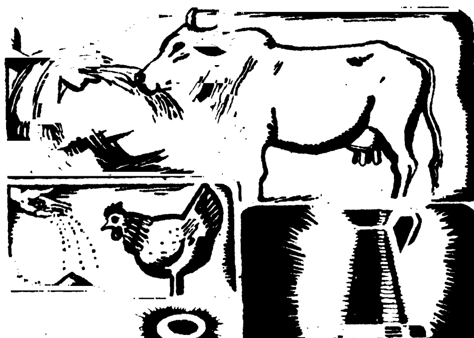
ঋণের ভারে সে আর চলতে পারছে না, নাম মাত্র সুদে টাকা ধার দিয়ে তার এই কষ্ট লাঘব করা উচিত। তাছাড়া, যানবাহন ও ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধা, উৎপন্ন বস্তুর সর্বনিম্ন দর বেঁধে দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে চাষীকে অনেকখানি সাহায্য করা যায়।

আমাদের ভূমিব্যবস্থা বর্তমানে যেরূপ আছে সেইরূপই যদি থাকে তাহলে চাষীদের পক্ষে উপরোক্ত উন্নত ব্যবস্থাগুলির সুবিধা লাভ করা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে তর্ক চলতে পারে। **বর্তমানে চাষীরা সমগ্র জমির মাত্র একতৃতীয়াংশের মালিক**। কৃষিব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন না করলে ভারতীয় কৃষিকে দাঁড় করানো যাবে না—লণ্ডনের 'ইকনমিষ্ট' কাগজের এই মন্তব্যের সঙ্গে অনেক বিশেষজ্ঞই একমত। এই বিপ্লবসাধনের অর্থই হলো চাষের জমির মালিকানা চাষীদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। শুধু তাই নয়, জমি যাতে না ভাগাভাগি হয়ে টুকরো টুকরো চিল্‌তে ভূমিতে পরিণত হয় সেই ব্যবস্থাও এই সঙ্গে করা দরকার। জমি ভাগ ভাগ হবার ফল কী হয় আজকের দিনে সেটা আমরা ভালো করেই প্রত্যক্ষ করছি। বর্তমানে জমিদার প্রায়ই জমির দেখাশুনো করেন না, শহরে আমোদ প্রমোদ ক'রে কাটান—এই যে ব্যবস্থা বহুদিন ধ'রে প্রচলিত রয়েছে তার অন্তর্নিহিত গলদগুলি দূর করবার জন্য-যেসব সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দরকার তাও সেই বিপ্লবের অঙ্গীভূত। সব চাইতে যা প্রয়োজন তা হলো এই যে সত্যি সত্যি যে চাষ করবে সে যেন বুঝতে পারে জমি তার নিরাপদ এবং তার চাষের অন্নে আর কেউ ভাগ বসাতে আসবে না, পরিশ্রমের ফল তার আর তার পরিবারেরই শুধু ভোগ্য। জমির উপর কৃষকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হলে তবেই কৃষকরা নিরাপদ ও উৎসাহিত বোধ করতে পারে। কিন্তু

মালিকানাই সব নয়, সমবায় পদ্ধতিতে যৌথ কৃষিক্ষেত্রের পত্তন করাও দরকার। তাহলেই শুধু এদেশে উন্নত কৃষিব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে পারে।

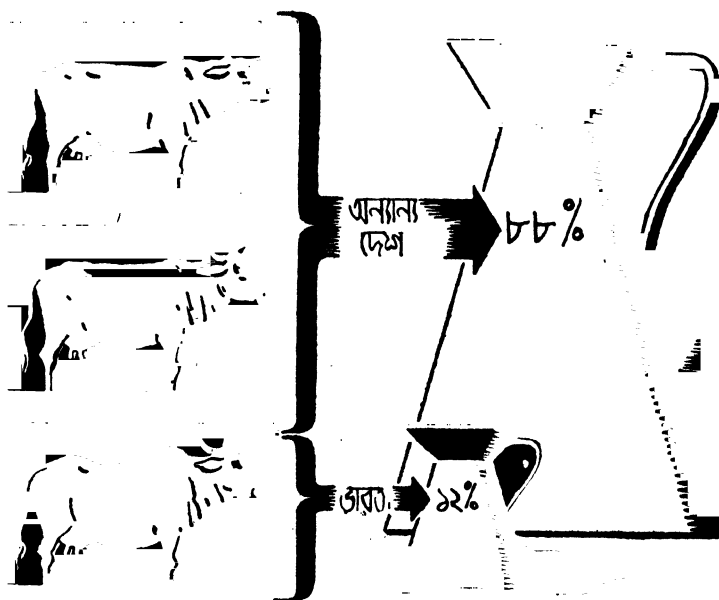
শস্য, শাকসব্জী, ফল প্রভৃতি যে সব খাদ্যবস্তু জমি থেকে সরাসরি পাওয়া যায় তাদের চাষ কী ভাবে বাড়ানো যায় এতোক্ষণ আমরা শুধু সেই কথাই বলেছি। কিন্তু এছাড়াও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আছে, যেমন দুধ, মাছ, মাংস ও ডিম। এক দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে, এই জান্তব খাদ্যগুলিকেও ভূমিজাত বলা যায়, তবে সেটা প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষ ভাবে। জমি থেকে যে শস্য উৎপন্ন হয় তা না খেয়ে আমরা করি কি গরু, ভেড়া, হাঁস-মুরগীকে প্রথমে বিশেষ ধরণের কতকগুলি শস্য খাওয়াই; পরে সেইগুলিই আবার আমাদের দেওয়া খাদ্যকে মাংস, ডিম, দুধের আকারে আমাদের ফিরিয়ে দেয়।

দুধ যে খুব মূল্যবান খাদ্য সে কথা আমরা আগেই বলেছি। সম্পূর্ণ গুণযুক্ত বল্‌তে যে খাদ্য বোঝায় দুধ তার সবচাইতে বেশি কাছাকাছি, কারণ দুধে প্রায় সবগুলি পুষ্টিকর উপাদানেরই সাক্ষাৎ মেলে। শিশুদের পক্ষে তা বিশেষ ভাবে দরকারী। দুধের উৎপাদন ব্যাপারে



আমরা যে কতো পেছনে প'ড়ে আছি এবং বর্তমানে দেশে যা দুধ পাওয়া যায় তার অন্তত চার পাঁচগুণ বেশি দুধ না হলে যে এই সমস্যা মেটবার

নয় সেকথাও আমরা আগে বলেছি। দেশে প্রায় বিশ কোটি গৃহপালিত পশু আছে—অর্থাৎ প্রতি দুইজন লোকের জন্যে একটি ক'রে পশুর ব্যবস্থা—পৃথিবীর সমগ্র সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। তা সত্ত্বেও এইরকম ঘট্‌ছে। এর কারণ আর কিছুই নয়, এ দেশের গরু। গড়পরতা রোজ একসেরের বেশি দুধ দেয় না, অথচ হল্যাণ্ডের গরু রোজ গড়ে দুধ দেয় দশ সেরেরও কিছু বেশি, ইংলণ্ডের গরু সাড়ে সাত সের আর নিউজীল্যাণ্ডের গরু সাত সের। একথা অবশ্য সত্য যে এদেশের গরুর দুধে যে পরিমাণ স্নেহপদার্থ পাওয়া যায় অন্যদেশের



গরুতে তা পাওয়া যায় না, সেইদিক দিয়ে আমাদের কিছুটা ক্ষতি পুষিয়ে যায় সন্দেহ নেই। হিসেব ক'রে দেখা গেছে এদেশের গরুর দুধের স্নেহ-

পদার্থের পরিমাণ পাশ্চাত্যের গরুর দুধের স্নেহপদার্থের পরিমাণের চাইতে শতকরা ২৫ থেকে ৫০ ভাগ বেশি, আর ভারতীয় মোষের দুধের স্নেহপদার্থ অন্যান্য দেশের মোষের দুধের স্নেহপদার্থের একেবারে দ্বিগুণ। সে যাই হোক, এ সব ছোটোখাটো সুবিধা বাদ দিলে দেখা যায়, পৃথিবীর সমগ্রসংখ্যক গৃহপালিত পশুর প্রায় একতৃতীয়াংশ ভারতবর্ষে রয়েছে বটে, কিন্তু তা থেকে আমরা যে দুধ পাই তা পৃথিবীর মোট পরিমাণ দুধের শতকরা ১২ ভাগ মাত্র। বিশ কোটি গৃহপালিত পশুর সাহায্যে আমরা যে দুধ পাই জার্মাণী মাত্র দুইকোটি পঞ্চাশ লক্ষ পশুকে দিয়ে সেই পরিমাণ দুধ আদায় করে।

কী হ'লে এই অবস্থার প্রতিকার হ'তে পারে? স্পষ্টতই, আমাদের গরু, ভেড়া, মোষের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় এবং ঠিক আমাদের মতনই তাদের খাইয়ে-পিটে মজবুত করা দরকার। বর্তমানে তারা সম্পূর্ণ আধাপেটা খেয়ে আছে আর এই ব্যবস্থা বহুদিন ধ'রেই চলে আস্‌ছে। এই অবস্থার প্রতিকার করতে হ'লে প্রথমেই তাদের খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বিচালি, ঘাস, ভূষি, খৈল যা কিছু গৃহপালিত পশুর খাদ্য সবই অধিকমাত্রায় তাদের পাওয়া দরকার। তারপর, উৎকৃষ্ট ও উন্নত ধরণের পশু লাভ করতে হ'লে পশুজননের পদ্ধতির দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। আশা করা যায় এইসব ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে অচিরেই ভারতীয় গরু ভেড়া মোষ অনেক বেশি পরিমাণে দুধ দেবে। হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, নিউজীল্যাণ্ডের মতো হয়ত সে দুধের পরিমাণ ততো বেশি না-ও হ'তে পারে, কিন্তু তা হলেও উন্নতি নিতান্ত সামান্য হবে না।

এই উন্নতির অর্থ, বর্তমান কৃষি-পদ্ধতি বাতিল ক'রে যাকে বলে মিশ্র কৃষিপদ্ধতি তাকে গ্রহণ করা। মিশ্র কৃষিপদ্ধতিতে শস্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে গোপালনেরও ব্যবস্থা থাকে। শস্য উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে

প্রথমে কৃষিব্যবস্থার সুরু এটাই পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। চাষীর জীবনে গোপালনের সমস্যা দেখা দিল তারও অনেক পরে। যাকে বলে মিশ্র কৃষিপদ্ধতি তা এই ভাবে চাষীর জীবনের অন্তর্ভুক্ত হ'লো এবং এই পদ্ধতি অনুসারে কৃষিকর্ম আরম্ভ হলো। বিশেষ ভাবে ভারতের পক্ষে এই পদ্ধতি সম্যক উপযোগী। তার কারণ স্যর জন রাসেল এইরূপ বর্ণনা করেছেন: "বিরলবসতি বিস্তীর্ণ, মুক্ত অঞ্চলের চাষবাস বড়ো বড়ো যন্ত্রপাতির সাহায্যে সবচাইতে কম ব্যয়ে সমাধা হতে পারে কিন্তু ছোটো ছোটো খামার সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না, সেখানকার চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন, ডিম, আনাজ, ফল ইত্যাদি খাদ্যবস্তুর উৎপাদন অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে। পরিচালন ব্যবস্থা ভালো হ'লে শিক্ষাপ্রাপ্ত চাষীর জীবনে তা একটা চমৎকার অবস্থার সৃষ্টি করে।"

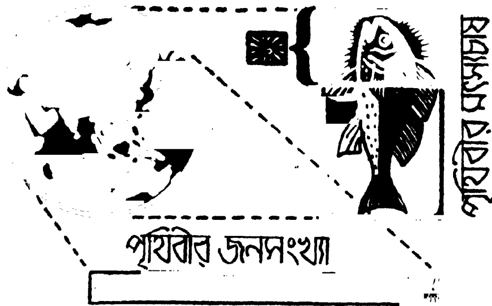
শাকসব্জীর ভেতর যে প্রোটিন পাওয়া যায় জান্তব প্রোটিন তার চাইতে বেশি কার্যকরী, তাই মাছ, মাংস ডিম প্রভৃতির উৎপাদন খুবই জরুরী ব্যাপার। যাদের মাছ মাংস ডিম খেতে বাধা নেই, তাদের পক্ষে এসব খাদ্য খুবই মূল্যবান। সর্বগুণাধার খাদ্যের অনেকগুলি উপকরণই এদের মধ্যে আছে। এখানেও দেখি, চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের পরিমাণ নিতান্ত কম। আমিষভোজী লোকের সংখ্যা স্বভাবতই এদেশে অল্প, তবু, এদের প্রয়োজনও বর্তমান সরবরাহে মিটতে চায় না। আজকের দিনে মিশ্র কৃষিপদ্ধতি এদেশে সামান্যমাত্র চালু হয়েছে, আরও ব্যাপকভাবে যদি তাকে চালু করা যায় তা হ'লে তার ফলে আমরা যে শুধু অধিক দুধই পাবো তা-ই নয়, মাংস আর ডিমও প্রচুর পরিমাণে পাবো।

মাছের উৎপাদন বাড়ানো বোধ হয় সব চাইতে সম্ভব। বর্তমানে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদনের পরিমাণ হলো চারলক্ষ পঞ্চাশ

হাজার টন আর নদী নালার মাছের পরিমাণ হলো দুইলক্ষ বিশহাজার টন। যথাযথ ব্যবস্থার দ্বারা সামুদ্রিক মাছের চাষ এর চাইতে বহুগুণ বাড়ানো যেতে পারে। পুকুর ও নদীর মাছের চাষেরও উন্নতি সম্ভব। জেলেরা যাতে গভীর সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরতে পারে তার জন্যে বড়ো বড়ো মাছ ধরবার নৌকো দরকার আর সেইসব মাছ হাটে বাজারে নিয়ে আসবার জন্যে চাই দ্রুতগতি মোটরলঞ্চ। আমাদের হাতে আসতে না আসতে মাছ যাতে পচে না যায় তার জন্যে পচননিবারক দ্রব্য ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা থাকা দরকার। বর্তমানে এই বিষয়ে অবস্থা এমনই শোচনীয় যে কিছুদিন আগে বোম্বাইর জেলেরা এই ব'লে অভিযোগ করেছিল যে ঠিক দামে বরফ পাওয়া যায় না ব'লে প্রচুর পরিমাণ মাছ পচে যায় এবং বাধ্য হয়ে সেসব তাদের ফেলে দিতে হয়।

বেশি মাছ পাওয়া গেলে আমাদের খাদ্যে পুষ্টিকারিতার ভাগ বৃদ্ধি পাবে এই প্রশ্ন ছেড়ে দিলে আরও এক দিক থেকে মাছের চাষ কাম্য। যতো বেশি মাছ পাওয়া যাবে ততো বেশি মাছের যকৃতের তেল পাওয়ার সুবিধা হবে—সেটা একটা মস্ত বড়ো লাভ। শিল্প হিসাবে হাঙরের যকৃতের তেল উৎপাদন করার বৃহৎ সম্ভাব্যতা এদেশে রয়েছে। আমাদের দেশবাসীরা খাদ্যপ্রাণের অভাবজনিত নানা রোগে ভুগছে, সেই রোগ প্রতিরোধ করবার পক্ষে হাঙরের যকৃতের তেল বিশেষ কাজে লাগবে। জাপান এইটুকুন একটি দেশ, সেখানকার লোকসংখ্যা পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা সোয়া তিন ভাগেরও কম। তাহলে কি হয়। জাপানে মাছের চাষের কেন্দ্র অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি—পৃথিবীর সমগ্র সংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ। জাপানীরা ঠিক আমাদের মতই অন্নভোজী—কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ মাছের সাহায্যে তারা সেই অন্নপ্রধান খাদ্যের ত্রুটি দূর করতে সমর্থ হয়েছে। একজন

সাধারণ ভারতবাসী ও একজন সাধারণ জাপানীর মধ্যে জীবনীশক্তি ও বলশালিতার যে তফাৎ তার আংশিক কারণ বোধ হয় এই যে জাপানীরা আমাদের চাইতে অধিক পরিমাণে মাছ খায়। এই বিষয়ে অন্তত আমরা জাপানীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে উপকৃত হ'তে পারি।



১১

খামার থেকে রান্নাঘর

লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থার অনেকগুলি ধাপ আছে, আরও খাদ্য বাড়ানো হ'লো তার প্রথম ধাপ। খাদ্য শুধু জন্মালেই চল্‌বে না, তাকে ক্ষুধিতের মুখে পৌঁছে দেবার কাজটিও কম জরুরী নয়। এইজন্যে যে যে প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া দরকার তাদের সুপরিচালনার উপর নির্ভর করছে লোক খেতে পাবে কি উপবাসী থাকবে।

স্পষ্টতই, এই ব্যাপারে যানবাহনের সমস্যা হ'ল আসল সমস্যা।

প্রথমে গ্রাম থেকে খাদ্য সহরের বাজারে স্থানান্তরিত কর', তারপর সেখান থেকে বড়ো শহর, জিলা, প্রদেশ যেখানে যেখানে তাদের চালান দেওয়া দরকার সেখানে পেঁছে দেওয়া—এই হচ্ছে কাজ। এই কাজ নানা উপায়ে সম্পন্ন হ'তে পারে। কিছুটা পথ গরুর গাড়িতে, কিছুটা পথ মোটর ট্রাক-এ, কিছু অংশ রেলগাড়ীতে আর কিছু অংশ নৌকোয় এইভাবে সাধারণত সেই খাদ্য গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌছয়। কাজেই খাদ্য প্রেরণের কাজে রাস্তাঘাট, রেলগাড়ি ও নৌকাচলাচলের যথেষ্ট সুবিধা থাকা দরকার। অন্যান্য বিষয়ের মতো এবিষয়েও অনেক কিছু করবার বাকী আছে। আমাদের দেশের (আয়তন ১,৫৮০,০০০ বর্গমাইল) রেলপথের দৈর্ঘ্য হলো মোটে ৪১,০০০ মাইল। সেইস্থলে রাশিয়া বাদে ইউরোপের রেলপথের দৈর্ঘ্য হ'লো ১৯০,০০০ মাইল। অথচ ভারতবর্ষের তুলনায় তার আয়তন সামান্যমাত্র বড়ো। ব্রিটিশ ভারতের এলাকায় প্রতি ১০০ বর্গমাইল পরিমাণ জায়গাতে যেখানে মাত্র ৩৫ মাইল রেলপথ রয়েছে। সেখানে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের ঠিক অই পরিমাণ জায়গাতে রেলপথ রয়েছে যথাক্রমে ৩০০, ২০০ ও ১০০ মাইল। এইজন্যই পঞ্চদশ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় রেলপথের দৈর্ঘ্য দেড়গুণ আর রাস্তার মাইলের পরিমাণ দ্বিগুণ করবার প্রস্তাব করা হয়েছে।

শুধু রেলপথ আর রাস্তাঘাট বানালেই চলবে না খাদ্যবহন করবার জন্যে মালগাড়ী এবং মোটরট্রাক্ প্রভৃতিও বানানো দরকার। ভারতের জাতীয় যান বলতে বর্তমানে গরুর গাড়ীকেই বোঝায়। গরুর গাড়ীর চাকা হয় লোহার তৈরী নয়তো কাঠের—ফলে রাস্তা ও ভারবাহী গরু এই দুইয়ের উপরই ভয়ানক চাপ পড়ে। অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে পল্লীঅঞ্চলকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে গরুর

গাড়ী এখনও আরও বহুদিন কাজে লাগবে। তবে পণ্যবাহী গাড়ীগুলিতে রবারের টায়ার লাগানো দরকার। আজকের দিনে এটা আরও বিশেষ ভাবে চাই এই জন্যে যে তাতে করে ভারবাহী বলদ আর রাস্তার উপরিভাগ এই দুইয়ের উপরই চাপ অনেক পরিমাণে কমে আসবে।

খাদ্য গোলাজাত করার কাজটিও খুব উল্লেখযোগ্য। পথের বিভিন্ন জায়গায় খাদ্য ধ'রে রাখবার ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক। বর্তমানে এই বিষয়ে যত্ন নেওয়া হয় না ব'লে অনেক খাদ্য শুধু শুধু নষ্ট হয়; ইঁদুর, পোকামাকড়েও কম নষ্ট করে না; আলোহাওয়ার অভাবে আর অযত্নের ফলেও কিছু পরিমাণ খাদ্যের অপচয় ঘটে। হিসেব ক'রে দেখা গেছে বৎসরে প্রায় তেত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন খাদ্য বৃথা অপচয় হয়, তার মধ্যে এক ইঁদুরের কল্যাণেই নষ্ট হয় প্রায় দশ লক্ষ টনের মতো। কাজেই খাদ্যসঞ্চয়ের উন্নততর ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

খামার থেকে খাদ্য পাকশালায় যাবার পথে বিক্রয়ব্যবস্থাও একটি জরুরী প্রক্রিয়া। উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছতে খাদ্য হাতবদল হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেক-বার এই হস্তান্তরের প্রক্রিয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। বর্তমানে এই ধরণের মধ্যবর্তী লোকের সংখ্যা অগুণতি—দালালি ক'রে এদের সবাই বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। এর ফলে এই হয় যে আমি-আপনি যে খাদ্যের জন্যে গোটা একটা টাকা ব্যয় করি তার মাত্র আট আনা কি দশ আনা শেষ পর্যন্ত চাষীর ঘরে গিয়ে পৌঁছয়—বাকীটা মাঝপথে দালালরা লুফে নেয়। ক্ষেতে উৎপন্ন দ্রব্যের জন্যে



চাষীকে যদি তার ন্যায্য মূল্য দেওয়া হয় তবেই সে ক্রমে কর্মঠ হয়ে উঠতে আর ক্ষেত থেকে তার সবটুকু শস্য আদায় করতে পারে। কাজেই খাদ্যদ্রব্যের জন্য আমরা যে দাম দিই তার সবটুকু না হলেও অন্তত যতোটা সম্ভব তার হাতে গিয়ে পৌছান দরকার। সমবায়-মূলক বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যুদ্ধকালে সমবায়পদ্ধতি ব্রিটেনে এতোই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে যে সমগ্র লোক-সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আজ সমবায় সমিতির উপর নির্ভরশীল। ব্যবসাবানিজ্য যে অনুপাতে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের হাতে থাকবে ঠিক সেই অনুপাতে লাইসেন্সপ্রথা, দর-বেঁধে-দেওয়ার নীতি ও বিশুদ্ধ খাদ্য আইন প্রভৃতি প্রবর্তন করতে হবে। বিবেকহীন দালালদের হাত থেকে অশিক্ষিত, অজ্ঞ চাষী আর ক্রেতার স্বার্থ রক্ষা করতে হলে এ সবের বিশেষ প্রয়োজন।

শুধু যে ন্যায্য মূল্যই চাষীর পাওনা তা নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখতে হবে তার দামের যেন খুব বেশি উঠ্‌তি-পড়্‌তি না হয়।

খাদ্যের দর বেঁধে দিয়ে এই অনৈশ্চিত্য দূর করা যায়। স্থায়ী দামের সুবিধা এই যে চাষী তাতে এই ব'লে নিরাপদ বোধ করে যে আর যাই হোক্ যা সে উৎপাদন করছে বিক্রি করলে তার উপযুক্ত দাম সে পাবে। অতীতে বহুবার এরকম হয়েছে যে নিছক আন্তর্জাতিক কারণে—যার উপর ভারতীয় চাষীর কোনই হাত নেই—দ্রব্যমূল্য এতো নেমে গেছে যে চাষীর দুর্দশা চরমে গিয়ে ঠেকেছে। এর ফল হয় এই যে চাষী তার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, সর্বপ্রযত্নে চাষবাস করা তার দ্বারা আর হয় না। সরকারের উচিত উদ্বৃত্ত শস্য কিনে ভবিষ্যতের দুর্দিনের জন্যে তাকে গোলাজাত ক'রে রাখা। শুধু এই উপায়েই মূল্য স্থিতিশীল করা সম্ভব। এ করতে হলেই উদ্বৃত্ত শস্যের ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা দরকার। আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের সরকার এইভাবে উদ্বৃত্ত শস্য গোলাজাত করার ব্যবস্থা করেছেন। মূল্য স্থিতিশীল রাখা আর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দুর্দিনের জন্যে তৈরী থাকা—এতে এই দুই কাজই হয়। এইজন্যেই খাদ্য আর কৃষিবিষয়ক সম্মিলিত জাতি-সম্মেলনের এক প্রস্তাবে এই মর্মে সুপারিশ করা হয়েছে যে কতকগুলি মূল খাদ্য নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর জন্য একটি সাধারণ খাদ্যভাণ্ডার সৃষ্টি করা হোক্। পৃথিবীর যে-যে অঞ্চলের প্রয়োজন সব চাইতে অপরিহার্য ব'লে মনে হবে সেই সেই অঞ্চলে সত্বর যাতে সঞ্চিত খাদ্য প্রেরণ করা যায় তারই জন্যে এই ব্যবস্থা দরকার। প্রস্তাবিত খাদ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্যে সম্মেলন থেকে একটি কমিটি নিয়োগেরও প্রস্তাব হয়েছে। আমাদের এ দেশেও খাদ্যশস্যনির্ধারণ কমিটি একটি কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করবার প্রস্তাবের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে এই খাদ্যভাণ্ডারে কম ক'রে হলেও অন্তত ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুত রাখা চাই। রিপোর্টে তাঁরা একথা বলেছেন যে "কৃষকের কাছ থেকে

ক্রেতার কাছে সব চাইতে বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য পৌঁছুবার নির্ভরতম উপায় হচ্ছে একটা কেন্দ্রীয় খাদ্যভাণ্ডার সৃষ্টি করা”। কমিটি সুপারিশ করেছেন যে এই ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠাকল্পে ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বাইরে থেকে ভারতে অবিলম্বে আমদানী করা হোক। দুর্ভাগ্যবশত, এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত কোনো চালান এযাবৎ আমাদের হস্তগত হয়নি। দুর্ভিক্ষের বৎসর এই ধরণের একটি খাদ্যভাণ্ডার যদি আগে থেকেই থাক্‌তো তা হ'লে বাংলাদেশে অনাহারে আর অনাহারজনিত রোগে ৩৫ লক্ষ লোক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগের হিসাব) এমন শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হ'তো না।

খাদ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আরও একটি প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবে জড়িত। সেটি হ'লো খাদ্যসংরক্ষণ। অন্যান্য দেশে খাদ্যসংরক্ষণ প্রণালী বিশেষ উন্নতিলাভ করেছে। খাদ্যসংরক্ষণের একটি সুপরিচিত উপায় তাকে ঠাণ্ডা রাখা—বরফজলের সাহায্যে এই উপায় সাধন করা হয়ে থাকে। মাছ, মাংস, দুধ, দুধের তৈরী জিনিষ, সব্জী, ফল প্রভৃতি খাদ্যবস্তুর বেলাতেই এই প্রক্রিয়া বিশেষ দরকার হয়। আমাদের এই দেশে, বোম্বাই প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরে, মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক পচননিবারক ঠাণ্ডা কুঠরীর ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে খাদ্য মজুত ও সংরক্ষিত হয়ে থাকে। যাঁরা ধনীব্যক্তি তাঁরা অবশ্য কেউ কেউ বাড়িতেই 'রেফ্রিজারেট্যর' রাখার ব্যবস্থা করেছেন। আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রগুলিতে বরফশীতল খাদ্যসিন্দুকের প্রচলন খুব বেশি; আর আজকাল বাড়ীতে ব্যবহারের জন্যে সহজধরণের সস্তা ছোটোখাটো 'রেফ্রিজারেট্যর'ও নাকি বেশ পাওয়া যাচ্ছে। ব্রিটেনেও, গার্হস্থ্য প্রয়োজনে খাদ্য সত্বর হিমশীতল করবার ব্যবস্থা আশাতীত উন্নতিলাভ করেছে। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে “খাদ্যকে নিরেট অবস্থায় এবং যথাসম্ভব

শীঘ্র 'বরফায়িত' করার কায়দাটাই হ'লো আসল। এইভাবে খাদ্য চটপট ঠাণ্ডা করার প্রক্রিয়ার ফলে খাদ্যমূল্যের কোনো তারতম্য হয়না, তার স্বাদগন্ধ আর পুষ্টিকারিতারও বিশেষ ক্ষতি হয় না। স্ট্রবেরী প্রভৃতি নরম ফলকে পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যে নিরেট অবস্থায় বরফায়িত করা দরকার; শাকসব্জীর বেলায়ও পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন সেকেণ্ডের বেশি সময় নেওয়া উচিত নয়। এইরূপ, মাছের বেলায় ষাট সেকেণ্ড বা এক মিনিট, মাংসের বেলায় নব্বুই সেকেণ্ড বা দেড় মিনিট—এইটুকু সময়ের মধ্যেই হিমশীতল করার প্রক্রিয়াটি সারা দরকার। 'বরফায়িত' ডিমকে দেড় বৎসর পর্যন্ত অবিকৃত রাখা যায়। টোম্যাটো আর কলা এইভাবে নয় মাস পর্যন্ত চমৎকার ঠাণ্ডা থাকে। কাঁচা টোম্যাটোকে সাতমাস পর্যন্ত বরফায়িত রাখার পর তাকে বের করে পাকানো হয়েছে এবং শেষে বরফ গলিয়ে ফেলা হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। এই প্রক্রিয়াতে ব্যয়ও নিতান্ত সস্তা—প্রতি পাউণ্ড খাদ্য এইভাবে ঠাণ্ডায় জমাতে বৎসরে এক পেনির বেশি খরচ লাগে না।

আরেক উপায়ে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়—সে উপায় খাদ্যকে শুকিয়ে ফেলা। এই প্রক্রিয়াকে ইংরিজিতে বলা হয় "dehydration", এর ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ হ'লো "জল বিদূরিত করা"। অধিকাংশ খাদ্যের ভেতরেই জলের ভাগ আশ্চর্যরকম বেশি। চাউল দাল প্রভৃতি খাদ্যশস্যের ভেতর শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ; মাছমাংস প্রভৃতিতে শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ; আর ফল ও সব্জীতে ৭৫ থেকে ৯৫ ভাগ পর্যন্ত জলীয় অংশ আছে।

আমাদের ভারতবর্ষে এক ধরণের "বিশুষ্কীকরণের" পদ্ধতি বহু শতাব্দী ধ'রে চলে আস্ছে। শুক্নো মাছ, শুক্নো কলা, ডুমুর, বেগুন আর খেজুর কিম্বা শুক্নো আম বা আম্‌সি এসব নিশ্চয়ই অনেকে

খেয়ে থাকবেন। রোদে শুকিয়ে এদের জলীয় অংশকে দূর ক'রে ফেলা হয়। ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে এইভাবে খাদ্য শুকিয়ে খাওয়ার পদ্ধতি বিশেষ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। মাছ, সব্জী ; ফল প্রভৃতি যেসব খাদ্যবস্তু সহজেই বিনষ্ট হয় তাদের কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস বাদে খাওয়ার সুবিধার জন্য সংরক্ষণ ক'রে রাখাই এই সনাতন প্রথাটির উদ্দেশ্য।

যুদ্ধ ব্যাপারটা বরাবরই খারাপ। শুধু তাই নয়, পাগলামির একশেষ। কদাচিৎ এর ফল ভালো হয়। তবে স্তূপাকার অকল্যাণের ফাঁকে মাঝে মাঝে সামান্য দুটো একটা জিনিষ আমাদের উপকারেও আসতে দেখা যায়। বর্তমান মহাযুদ্ধের অকিঞ্চিৎকর উপকারের তালিকায় এই একটি উপকার চোখে পড়ে যে তা খাদ্য বিশুষ্কীকরণের ক্ষেত্রে অসম্ভব উন্নতি ঘটিয়েছে। সৈন্য স্থানান্তরকরণ যেমন আধুনিক যুদ্ধের একটি বড়ো সমস্যা, তেমনি খাদ্যস্থানান্তরকরণও আরেকটি প্রধান সমস্যা। আনাজ আর ফল প্রভৃতি খাদ্যবস্তু জাহাজে-রেলগাড়ীতে যথেষ্ট জায়গা জুড়ে থাকে। কিন্তু যদি তাদের শুকিয়ে নেওয়া হয়, তা হ'লে স্বভাবতই তাদের আকার সঙ্কুচিত হ'য়ে আসে আর তাদের স্থানান্তরকরণের সমস্যাও অনেক সহজ হ'য়ে পড়ে।

এইজন্যেই আজকাল অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও খাদ্য বিশুষ্কীকরণের কাজ পুরোদমে চল্‌ছে। তবে রোদে শুকিয়ে নয়, খাদ্যবস্তুকে গরমজলে সিদ্ধ ক'রে তারপর পাঁচছয় ঘণ্টা ধ'রে তাদের উপর দিয়ে গরম হাওয়া চালিয়ে। ১৯৪৩ সনে এক ভারতবর্ষেই সৈন্যদের ব্যবহারার্থে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন আলু এইভাবে শুকোনো হয়েছে।

আজকাল শুকোবার আগে মাংস কিম্বা সব্জীকে প্রথমে সিদ্ধ করা

হয়, তারপর চুপসিয়ে ফেলা হয়। চুপ্সানো অবস্থায় তাদের মনে হয় যেন চকোলেটের টুক্রো। আপনার যদি তা খেতে ইচ্ছা হয়, সেই টুক্রোটিকে গরম জলের পাত্রে নিয়ে ছেড়ে দিলেই হলো, দেখবেন আস্তে আস্তে এর পুরনো চেহারা ফিরে আস্‌ছে আর ঠিক দু'তিন মিনিটের মধ্যেই এ সম্পূর্ণ খাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছে। তখন খেতে শুধু যে এর পুরনো স্বাদই পাবেন তা নয়, এর গন্ধটি পর্যন্ত প্রায় অবিকৃত অবস্থায় ফিরে পাবেন। তবে, কুকুরে শুষ্ক খাদ্যের পরীক্ষায় জানা গেছে, শুক্‌নো আনাজ কয়েকমাস একটানা ফেলে রাখ্‌লে তার খাদ্যপ্রাণ অনেকখানি কমে যায়। অনেকসময় স্বাদেরও তারতম্য ঘটে। এইরূপ বিশ্বাস যে বিশুষ্কীকরণের এর চাইতেও এমন উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে যার ফলে সম্ভাবিত খাদ্যপ্রাণঘটিত ক্ষতি কমে আস্‌বে, স্বাদগন্ধেরও খুব বেশি তফাৎ হবে না।

এই যুদ্ধকালীন আবিষ্কার যুদ্ধান্তে মানুষের স্থায়ী উপকারে আস্‌বে বলে আশা করা যায়। আম প্রভৃতি যে সব খাদ্যবস্তু বৎসরে কেবলমাত্র কয়েক মাসের জন্যে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় তাদের সমগ্র বৎসরব্যাপী ধরে রাখবার জন্যে উপরোক্ত আবিষ্কার প্রয়োগ করতে হবে। তা ছাড়া, ফল আর সব্জীর মতো যেসব জিনিষ অতি সহজে পচে যায় তাদের দূর দেশে চালান দিতেও এ কাজ লাগ্‌বে।

খাদ্য সংরক্ষণের আরেকটি উপায় হলো তাকে টিনে ভর্তী করা। আমাদের দেশে যেসব টিনের খাবার দেখা যায় তাদের অধিকাংশই বাইরে থেকে আমদানী হয়। তাই, সেগুলি শুধু ধনীদের নাগালেই আসে, গরীবরা তার ভাগ পায় না। ভারতবর্ষে খাদ্য-টিনে-ভর্তীর শিল্প সম্ভাবনাময়—সেই শিল্পপ্রতিষ্ঠার দ্বারা অল্পব্যয়ে খাদ্যসংরক্ষণ ক'রে আমাদের অনেক অভাব মেটানো যেতে পারে।

আরও যেসব প্রক্রিয়া অভ্যাস করা যেতে পারে তাদের ভেতর প্রাতরাশতৈরীর প্রক্রিয়া প্রধান। এই দিক দিয়ে খাদ্যশস্য থেকে 'পরিজ' ও ভাজি তৈরীর চেষ্টা করা যেতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে খাদ্যোৎপাদন অতিদ্রুত একটি আধুনিক শিল্পে পরিণত হতে চলেছে। এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উন্নতির সূচনা হয়েছে যৌগিক খাদ্যপ্রাণ উৎপাদনের চেষ্টায়। এই ধরণের খাদ্যপ্রাণকে 'যৌগিক' বলা হয় এইজন্যে যে তা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত: কাঁচা সব্জী আর দুধের ভেতর যে ধরণের স্বাভাবিক খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায় এ তাদের মতো নয়; এ তৈরী হয়ে থাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে কারখানায়। প্রকৃতির নিজে হাতে দেওয়া খাদ্য থেকে আমরা যে পরিমাণ পুষ্টিমূল্য আহরণ করি, উপরোক্ত কৃত্রিম খাদ্য থেকেও ঠিক সেই পরিমাণ পুষ্টিমূল্য পাওয়া যায় ব'লে ধারণা। যুদ্ধের পরে যাতে এইসব মূল্যবান পুষ্টিকারক খাদ্যোপকরণ সর্বসাধারণের নাগালের মধ্যে আসে সেই সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করা উচিত। খিদে পেলেও যাতে মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ থেকে বঞ্চিত না হয় সেইজন্যে অন্তত এই ব্যবস্থা করা দরকার।

এর চাইতেও বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নয়। আমেরিকার সর্বশেষ আবিষ্কার হ'লো যৌগিক মাংসের উৎপাদন। রসায়নবিজ্ঞানীরা গাঁজলা থেকে এমন একটি বস্তু প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছেন জন্তুমাংসের মতোই যার স্বাদগন্ধ। যথেষ্ট পরিমাণে যৌগিক মাংস প্রস্তুত করতে পারলে আসল মাংসের চাইতেও সস্তা দরে তাকে বাজারে ছাড়া সম্ভব হবে ব'লে দাবী করা হয়েছে। ভারতবর্ষের ন্যায় নিরামিষভোজী দেশের পক্ষে সত্যিই কী চমৎকার সমাধান! সবাই আমরা মাংসের স্বাদ উপভোগ করতো পাবো অথচ বেচারা ভেড়া কিংবা গরুর বাচ্চা কিম্বা মুরগী মারার

ফলে যে বিবেকদংশন অনিবার্য তা আর সইতে হবে না এর চাইতে চমৎকার আয়োজন আর কী হতে পারে!

১২

খাদ্যের সদ্ব্যবহার

আমাদের দেশের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ কতো বিভিন্ন উপায়ে বাড়ানো যেতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। এই সব উপায় সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হ'তে আরও কিছুদিন সময় নেবে। ইতিমধ্যে, আমাদের হাতে যা খাদ্য আছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করা উচিত। আমরা কি তা করছি? আমার তো মনে হয় করছি না। বর্তমানে যে পরিমাণ খাদ্য এদেশে উৎপন্ন হয় তার অনেকখানি আমরা অপচয় করি। খাবার শেষে থালায় বা পাত্রে যে ভুক্তাবশেষ পড়ে থাকে সেই সব ছোটোখাটো অপচয়ের কথা বলছি না, যে অপচয়ের বিষয়ে বলা হচ্ছে তা পাকশালায় কিম্বা খাদ্য পাকশালায় পৌঁছুবার আগেই ঘটে থাকে।

চারের অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি চাউল দাল প্রভৃতি খাদ্যশস্যের উৎকৃষ্ট পুষ্টিকারক উপাদান সমূহ আমরা কতোভাবে নষ্ট করি। চাউলের বহিস্থিত স্তর আর বীজকোষের প্রোটিন, খাদ্যপ্রাণ আর ধাতব লবণ অনাবশ্যক ছাঁটাই ও পালিশের ফলে কীভাবে বিনষ্ট হয় তাও আমরা সেখানে আলোচনা করেছি। ধান প্রথমে অর্ধসিদ্ধ ক'রে তারপর তাকে ঢেঁকিছাঁটা করা কিম্বা তিনচারবার কলে ছাঁটাইয়ের পরিবর্তে ধানকে কেবলমাত্র একবার কলেছাঁটাই করা—এই উপায়েই শুধু অপচয়

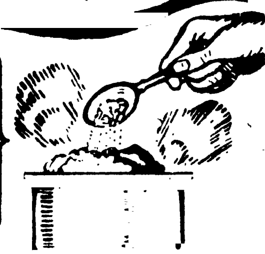
খাদ্য অপচয়ের কারণ



অধিকক্ষণ রান্না ও খোলাপাত্রে রান্না



শস্য কলছাঁটা ও পালিশ করা



খাদ্য শুকিয়ে ফেলা



খোসা ও বাকল ফেলে দেওয়া



ভাতের মাঁড় নষ্ট করা



ইঁদুর ও কীটের উৎপাত



নিবারণ আর ধানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হ'তে পারে। এইজন্যেই কলেছাঁটা চাউলের পরিবর্তে ঢেঁকিছাঁটা চাউল খাওয়ার জন্যে গান্ধীজি বহুবৎসর অনবরত ব'লে আসছেন। আজকের খাদ্যাভাবজনিত অনশন ভারতে এমন বহুবিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে সরকার পর্যন্ত এই অনাবশ্যক ক্ষয় নিবারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন এবং কোনও কোনও প্রদেশে চাউল অতিরিক্ত কলেছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। জাপানীরা বহুদিন আগেই এই ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝে নিয়েছে। তারাও এককালে ঠিক আমাদের মতোই কলেছাঁটা পালিশ চাউল খেতো; কিন্তু যখন তারা দেখলে এর ফল শরীরের পক্ষে মোটেই হিতকারক নয়, তারা সম্রাট হিরোহিতোকে দিয়ে আছাঁটা কিম্বা অর্ধছাঁটা চাউল খাওয়ার প্রথা প্রবর্তন করালে। দেখাদেখি সমস্ত জাপানীরা সম্রাটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলো। এই ব্যাপারে ভারতের কোন কোন প্রদেশের অধিবাসীদের অপরাধের সীমা নেই। আবার কোন কোন অঞ্চল আছে যেখানে এখন পর্যন্ত ঢেঁকিছাঁটা চাউল খাওয়ার প্রথাই সমধিক প্রচলিত। যেমন আসামে এখনও শতকরা ৯৭ ভাগ চাউল ঢেঁকিছাঁটা অবস্থায় খাওয়া হয়। তারপরেই সংযুক্ত প্রদেশ—সেখানকার শতকরা ৯৩ ভাগ চাউল ঢেঁকিছাঁটা। এইরূপ বিহার ও উড়িষ্যার শতকরা ৯০, বাংলার ৮৪, মধ্যপ্রদেশের ৭০ ভাগ চাউল ঢেঁকিছাঁটা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মান্দ্রাজে চাউল মোটে শতকরা ৩৮ ভাগ ঢেঁকিছাঁটা অবস্থায় খাওয়া হয়।

শাকসব্জী আরেকটি খাদ্যবস্তু যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার আমরা করি না। তরকারী রাঁধবার বেলায় আমরা প্রায়ই এমন সব শুকোবার মসলা ব্যবহার করি যার ফলে খাদ্যপ্রাণ খ, আর গ বিনষ্ট হয়ে যায়। খাদ্যপ্রাণ

গ অত্যন্ত স্পর্শকাতর—পাঁচমিনিটের মধ্যেই তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাজেই তরকারীতে শুকোবার মসলা ব্যবহার করা ঠিক নয়। খোলাপাত্রে রান্না করার ফলেও অনেকসময় বায়ুসংস্পর্শে খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হতে দেখা যায়। খাদ্য বায়ুলেশহীন বন্ধপাত্রে রান্না করলে এই অপচয় দূর হতে পারে। বস্তুত, যে কোন প্রকার অতিরিক্ত রান্নায় প্রায়ই খাদ্যপ্রাণ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে কি আমাদের শাকসব্জী কাঁচাই খাওয়া উচিত? এমন অনেক সব্জী আছে যাদের কাঁচা খেলে ভালো, তবে খাওয়ার আগে দেখা দরকার তাদের যথারীতি ধুইয়ে নেওয়া হয়েছে কিনা। অপরিষ্কার সব্জী খেলে প্রায়ই সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। আনাজের বাকল আর ফলের খোসা ফেলে দেওয়া ঠিক নয়, অবশ্য যদি তারা আহারযোগ্য হয়। চারের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, এই সব জিনিষ পুষ্টিবিধান করতে না পারেলেও কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করবার পক্ষে সহায়ক হ'তে পারে।

আমরা অনেক সময় দুধের গুণও নষ্ট করি। দুধ অতিরিক্ত জ্বাল দিলে তার খাদ্যপ্রাণ সম্পদ কমে যায়। অপরপক্ষে, দুধ তেমন ভাবে জ্বাল না দিলেও বীজাণুর আশঙ্কা থাকে এবং সেই দুধ পান করা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ ক'রে শিশুর পক্ষে তা মারাত্মক ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। সম্প্রতি, এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের একটি পথ পাওয়া গেছে। সেটি হ'লো দুধকে উনুনের উপর খুব মৃদু জ্বালে প্রায় বিশ মিনিট যাবৎ রেখে তারপর নামিয়ে ফেলা। বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের নামানুসারে এই পদ্ধতির নামকরণ করা হয়েছে Pasteurising। Pasteurising-এর সুবিধা এই যে তা বীজাণু ধ্বংসও করে, আবার খাদ্যপ্রাণ সম্পদকেও নষ্ট হ'তে দেয় না। কড়াজ্বালে শেষোক্ত সুবিধাটুকু পাওয়া যায় না। তবে ভারতবর্ষে দুধ কখনই কাঁচা খাওয়া উচিত নয়।

মৃদুজ্বালে দুধ খাওয়া অসুবিধাকর হ'লে দুধ বরং কড়াজ্বালে খাওয়াও ভালো তবু কাঁচা খেতে নেই।

আরেকভাবে দুধের অপচয় হয়। দুধ থেকে সর ও মাখন তুলে নেওয়ার পর যে জিনিষটি থাকে আমরা তার প্রায়ই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করি না। সরতোলা দুধ আসল দুধের মতো তেমন পুষ্টিকারক নয়; স্নেহপদার্থ চলে যাওয়ার ফলে তার অনেকখানি খাদ্যমূল্য নষ্ট হয়ে যায়। তা হলেও তাতে তখন পর্যন্ত প্রোটিন, শর্করা আর ধাতব লবণ থাকে এবং এগুলির প্রত্যেকটি বিন্দু যথোচিত কাজে লাগানো উচিত। ইউরোপ আর আমেরিকার লোকেরা সরতোলা দুধের মূল্য জানে, তাই তারা ভারতের কোন কোন অঞ্চল থেকে খুব সস্তা দামে সরতোলা দুধ কিনে দেশে নিয়ে যায় এবং তাদের দিয়ে শিল্পগত উদ্দেশ্যে কেসিন কিম্বা নানারকম স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক তৈরী করে। এই চতুর লোকেরা তারপর করে কি, এদেরই কতক অংশ নানারকম সুদৃশ্য বোতলে ভর্তী ক'রে পুনরায় ভারতের বাজারে রপ্তানী করে আর আমরা বোকারামরা তা কিনি। ইচ্ছে করলে যা আমরা কয়েক আনায় পেতে পারতুম বিলিতি ছাপ মারা ব'লে তার জন্যে আমরা এখন কয়েক টাকা পর্যন্ত দিতে দ্বিধা করি না!

দালের খাদ্যমূল্যও এইভাবে বাড়ানো যেতে পারে। দাল ভিজিয়ে রাখ্‌লে তাতে অঙ্কুর জন্মে—এই অঙ্কুরোদ্গত দাল খাদ্যপ্রাণ গ-এর আধার সেকথা আমরা চারের অধ্যায়ে বলেছি।

এযাবৎ আমরা শুধু সেসব খাদ্যবস্তুর কথাই বলেছি যারা ক্রয়সাপেক্ষ কিন্তু এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যা কিন্‌তে পয়সা লাগেনা, প্রকৃতি সেসব আমাদের এমনিই অকাতরে বিলিয়ে দেয়। এরা হ'লো সূর্যালোক, খোলা বাতাস, জল। এই তিনটি উৎপাদনকেও খাদ্যবস্তু মনে করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, তাদের আমরা অনায়াসে পাই ব'লে তাদের

মূল্য ঠিক বুঝিনা। অনেকের ধারণা যে যা কিছু আমরা বিনামূল্যে পাই তা-ই তুচ্ছ। খোলা বাতাস আর সূর্যালোক হজম ও সাধারণ জীবনী-শক্তিবৃদ্ধির সহায়তা করে। সূর্যালোক আবার দেহে খাদ্যপ্রাণ ঘ-ও সঞ্চার করে---এই খাদ্যপ্রাণটি আমাদের বলিষ্ঠ ও জীবন্ত ক'রে তোলে। এই জন্যই দেখা যায়, দক্ষিণ ও মধ্যভারতের লোকদের খাদ্যে খাদ্যপ্রাণ ঘ-এর ব্যত্যয় ঘটলেও যেহেতু সেসব অঞ্চলে সূর্যকিরণ খুব প্রখর সেইহেতু তাদের রিকেট কিম্বা osteomalacia প্রভৃতি রোগ খুব কম হয়, অথচ উত্তর ভারতের মেয়েদের মধ্যে তাদের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। পর্দাপ্রথার দরুণ সেখানকার মেয়েদের অন্তঃপুরের চতুঃসীমায় আবদ্ধ থাকতে হয় ব'লে স্বভাবতই সূর্যকিরণ আর মুক্ত বাতাস থেকে তারা বঞ্চিত হয়। অন্যান্য খারাপ দিক ছেড়ে দিলেও, একমাত্র স্বাস্থ্যের কারণেই পর্দাপ্রথা উঠিয়ে দেওয়া উচিত।



[বাকী রইলো জল।] অন্তর্নিঃসরণের কাজে আর যে সব খাদ্য ভালো হজম হয়নি তাদের তরল করতে জল অনেকখানি সহায়তা করে। এইভাবে খাদ্য পরিপাক ও জীর্ণ হয়। জল প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত—আহারের মধ্যবর্তী সময়ে খেলেই সবচাইতে ভালো।

১৩

খাদ্য আর আয়

আমাদের খাদ্যে পুষ্টিকারক উপাদান কম আর তা সম্যক্ মাত্রাবিশিষ্ট নয় এর একটি দুটি কারণ নয়, অনেকগুলি কারণ বর্তমান। একটি কারণ হলো বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে দেশবাসীর বিরাট অজ্ঞতা। আরেকটি কারণ, অভ্যাসদোষ—প্রায়ই ধর্মীয় কুসংস্কার এই অভ্যাস বা প্রথার জনক। কিন্তু আসল কারণ অজ্ঞতাও নয়, অভ্যাসদোষও নয়। সেটি দারিদ্র্য। খালিপেটের প্রধান হেতু শূন্য পকেট।

লোকের আয় যতো বৃদ্ধি পায় ততোই তার খাদ্যের পরিমাণ বাড়ে, শুধু তাই নয় তখন খাদ্যের গুণের দিকটাও সমৃদ্ধ হয়। এটা যে শুধু এদেশ সম্বন্ধেই সত্য তাই নয়, অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও সত্য। ধনী শ্রেণীর লোকেরা স্বভাবত ভালো খাদ্য খায়, যদিও অনেকসময়ই তাদের আহারের মাত্রা ঠিক থাকে না। মধ্যবিত্ত ঘরের লোকদের অবশ্য এতো ভালো খাদ্য জোটে না, তবে তারা নেহাৎ খারাপও খায় না। চাষীমজুরশ্রেণীর লোকদের বরাতই যা মন্দ: প্রয়োজন অনুপাতে খাদ্য তারা কখনই পায় না। এর কারণ খুবই সরল। ডিম, ফল, দুধ, সব্জী, মাংস প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্যগুলি চাউল দাল প্রভৃতি খাদ্যবস্তুর

চাইতে স্বভাবতই বেশি দামী, কাজেই চাষীমজুরের ভাগ্যে সেসব খুব কমই জোটে। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গায় চাউল দাল প্রভৃতি খাদ্যশস্য যতোটা উৎপন্ন করা যায় মাংস, ডিম, দুধ সেই পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। ঠিক এই কারণে শেষোক্ত খাদ্যগুলির জন্যে অধিক দাম দিতে হয়। সাদাসিধে খাদ্যের চাইতে খাদ্যমূল্যবিশিষ্ট খাদ্য বরাবরই একটু বেশি দামী।

খাদ্যবিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন অঞ্চলে এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান করেছেন তাতে দেখা যায় আয়ের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের গুণাগুণেরও পার্থক্য ঘটে। জামসেদপুরের ডাঃ কে, মিত্র ১৯৩৯ সালে টাটার কারখানার কর্মীদের ভেতর এইরূপ একটি অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করেন। অনুসন্ধানের ফল নিচে দেওয়া গেলো ঃ

	১	২	৩	৪
মাসিক আয়	৩০ টাকা পর্যন্ত	৩০ টাকা থেকে ৪৫ টাকা	৪৫ টাকা থেকে ৯০ টাকা	৯০ টাকা ও তদূর্ধ্বে
দৈনিক আহার		(আউন্স)		
চাউল বা গম	২৩.৯	২৪.৪	২৭.১	২১.০
দাল ...	২.৪	৩.১	৩.৮	৩.৪
পত্রহীন আনাজ ...	২.৩	২.৭	৫.৫	৬.২
পত্রযুক্ত আনাজ ...	১.২	১.০	০.৩	০.১
ফল ও বাদাম ...	০.১	০.৩	০.৯	০.৯
তৈল ও স্নেহপদার্থ	০.৫	০.৮	১.৩	১.৮
দুধ ...	০.৫	১.৪	২.৬	৫.৭
মাছ, মাংস, ডিম	০.৬	০.৭	১.৩	১.০
আচার, মোরব্বা প্রভৃতি	০.৭	১.০	১.৬	১.৬

	১	২	৩	৪
মাসিক আয়	৩০ টাকা পর্যন্ত	৩০ টাকা থেকে ৪৫ টাকা	৪৫ টাকা থেকে ৯০ টাকা	৯০ টাকা ও ঊর্দ্ধে
দৈনিক আহার		(আউন্স)		
চিনি ও গুড় ...	০.২	০.৩	০.৭	০.৮
ক্যালরি ...	২৯৪০	৩১৯০	৩২৫০	৩৩৩০
খাদ্যশস্যের শতকরা হিসাব ...	৮৩.৯	৭৪.৯	৬৮.০	৬১.৮

এই তালিকা থেকে বোঝা যায় কর্মীর আয় যতোই বাড়ছে ততোই তার আহার অধিক গুণযুক্ত ও বিচিত্র হচ্ছে। ক্যালরির সংখ্যা দেখেই যে তা বলা যায় তা নয়, বিভিন্ন খাদ্যের মাত্রা লক্ষ্য করলেও এটা ধরা পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ৯০ টাকার উপর যে ব্যক্তির আয় তার খাদ্যে খাদ্যশস্যের ভাগ কম, কিন্তু তার চাইতে যারা কম মাইনে পায় তাদের খাদ্যে খাদ্যশস্যের পরিমাণ বেশি। অপরপক্ষে দেখা যায় প্রথমোক্ত ব্যক্তিটির সব্জী আর দুধের বরাদ্দ ওদের চাইতে অনেক বেশি।

১৯৪১-৪২ সালে গুজরাট অনুসন্ধান সমিতি বোম্বাই সহরের নিম্ন-মধ্যবিত্ত গুজরাটিদের মধ্যে অনুরূপ এক অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করেন—সেখানেও সেই একই ব্যাপার চোখে পড়ে। চারটি শ্রেণীর হিসাব নেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর লোকদের আয় ৫০ টাকার অনূর্দ্ধে, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের আয় ৫১ টাকা থেকে ১০০ টাকার মধ্যে, তৃতীয় শ্রেণীর ১০১ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত আর চতুর্থ শ্রেণীর ১৫০ টাকার উর্দ্ধে। নিচের হিসাব থেকে বুঝতে পারবেন প্রধান প্রধান খাদ্যবস্তুর ব্যাপারে চারটি শ্রেণীর মধ্যে কতো পার্থক্য :

আয়ের শ্রেণী	চাউল, দাল	ঘি ও তৈল	চিনি, গুড়	দুধ আর দুধের তৈরী জিনিষ	শাকসব্জী
	আউন্স	আউন্স	আউন্স	আউন্স	আউন্স
প্রথম	১৫.৬	২.১৯	১.১৮	৫.৭	৪.২
দ্বিতীয়	১২.৭	২.১৮	১.৪৫	৯.০	৬.২
তৃতীয়	১১.৭	২.৫৯	১.৮৪	১০.৬	৬.২
চতুর্থ	১২.৩	২.৫৩	১.০৭	১১.১	৬.৮

এর থেকে বোঝা যায় আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের গুণও কতো বাড়ে।

মানুষ কে কতোটুকু দুধ খায় তা তার রোজগার দেখেই বলা যায়। আবার এর উল্টোটিও সত্য। ১৯৪৩ সালের দুধের ক্রয়বিক্রয়ের যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তাতে লাহোরের একটি অনুসন্ধানকার্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায়, ২৫ টাকা পর্যন্ত যাদের আয় তাদের মাথাপিছু রোজ দেড়ছটাকের বেশি দুধ জোটে না। এদিকে হাজার টাকার উপর যাদের আয় তাদের মাথাপিছু রোজ বরাদ্দ কমপক্ষে একসের দুধ। নিচের তালিকায় গোটা হিসাবটি দেওয়া হ'লো :

২৫ টাকা পর্যন্ত	...	মাথাপিছু	রোজ	৩.৮	আউন্স
২৬ টাকা থেকে ৫০ টাকা	...	„	„	৯.২	„
৫১ টাকা থেকে ১০০ টাকা	...	„	„	১২.০	„
১০১ টাকা থেকে ২০০ টাকা	...	„	„	১৩.৬	„
২০১ টাকা থেকে ৫০০ টাকা	...	„	„	১৬.০	„
৫০১ টাকা থেকে ১০০০ টাকা	...	„	„	২০.০	„
১০০০ টাকার উপরে	...	„	„	৩১.২	„

ভারতবাসীর মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ৬৫ টাকা এইরূপ অনুমান করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ মাসিক মাথাপিছু মাত্র পাঁচটাকা সাত আনা। পাঁচের অধ্যায়ে যে সর্বগুণাধার পথ্যের হিসাব দেওয়া হয়েছে যুদ্ধপূর্ব হিসাব অনুসারে তা সংগ্রহ করতে মাসে চারটাকা থেকে ছয় টাকার মতো ব্যয় হবার কথা। এই হিসাবে পিতামাতা আর তিনটি সন্তান-বিশিষ্ট একটি পরিবারের পক্ষে মাসে ষোল থেকে চব্বিশ টাকা পর্যন্ত খরচ হবে। যেহেতু লোকের খাদ্য ছাড়াও অন্যান্য অভাব পূরণ করতে হয় সেহেতু আমাদের অধিকাংশ লোকের পক্ষে সর্বগুণাধার খাদ্য সংগ্রহ করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। কাজেই, খাদ্যের বাবদ অর্ধেকের উপর টাকা খরচ হলেও পুষ্টিহীনতা এদের লেগেই আছে। বোম্বাই, আমেদাবাদ, শোলাপুর, মান্দ্রাজ, কল্‌কাতা প্রভৃতি সহরের শ্রমিকদের মধ্যে অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেছে যে তারা আয়ের অর্ধেকের বেশি নিজেদের আর পরিবারের অন্যান্য সকলের খাওয়ার পেছনে খরচ করে। "অর্ধেক জীবনসংগ্রাম আহারের জন্য সংগ্রাম" এ কথাটা তাদের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যারা সব চাইতে বেশি খাটে এবং কাজে কাজেই যাদের সবচাইতে বেশি খাদ্য দরকার, দেখা যায় তারাই সবচাইতে কম খেয়ে বেঁচে আছে। পুষ্টিবিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রদূত লাভোসিয়্যার এই বৈষম্যমূলক অবস্থার অন্তর্নিহিত বিদ্রূপকে নিম্নোক্ত কথায় কী চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন :

"যে লোক গতর খাটিয়ে খায়, বাঁচবার জন্যে যাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় সেই বেচারা পর্যাপ্ত খেতে পায় না এই অবস্থার জন্যে কে দায়ী? ধনী মোটেই পরিশ্রম করে না, সেই হিসাবে তার দেহের ক্ষয়ের অনুপাতও কম, অথচ দেখি সেই ভূরি ভূরি খায়। এই ভয়ানক বৈষম্য কেন? আমার তো মনে হয়

যে লোক খেটে দেহপাত করে ধনীর খাদ্য তারই প্রাপ্য আর সমধিক উপযুক্ত।"

এসবই নৈরাশ্যকর কথা। কিন্তু যা নৈরাশ্যকর নয় তা হচ্ছে এই অনুসন্ধানলব্ধ সত্য যে অজ্ঞতা আর কুসংস্কার সত্ত্বেও ভারতবাসী অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মতো খাদ্যের গুণ বাড়াতে সক্ষম, অবশ্য হাতে যদি তার কিছু বেশি পয়সা আসে। উৎপাদনবৃদ্ধি, জন্মহারলাঘব এবং অন্যান্য বিশেষ ব্যবস্থার ফলে অবস্থার অনেকখানি উন্নতি হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু আয়বৃদ্ধি হ'লে এই সম্বন্ধে অন্তত নিশ্চিত হওয়া যাবে যে আমাদের দেশের লোক আরও ভালো খেতে পাবে। কৃষি, শিল্প অথবা ব্যবসা যে কোন উপায়ে এই আয় বাড়ানো যেতে পারে। এতেই প্রমাণ হয় খাদ্য কিছু বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, দারিদ্র্যমোচনের সংগ্রামের সঙ্গে তা জড়িত। দেশের সম্মুখে দারিদ্র্যমোচনের সমস্যাই আজ প্রধান সমস্যা। একযোগে সকলের এই সমস্যা দূর করার চেষ্টা করা উচিত।